لا اله الا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৬তম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

৫ই সফর, ১৪১৫ হিঃ ॥ ৩১শে আষাঢ়, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই জুলাই, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ॥ ভারত ২ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ॥

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ১ম সংখ্যা (৫৬তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া ৪

জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ৯

জামাতের উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী
অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ১৬

একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র ও সিদ্ধান্ত
অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ১৭

মিশর দেখে এলাম
জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী ২৯

ছোটদের পাতা
পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৩

তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্তব্য ৩৭
জনাব মীর মোহাম্মদ আলী

সংবাদ ৩৮

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৪১

সম্পাদকীয় ঃ ৪৫

দোয়া তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে

"দোয়া এরূপ এক শক্তি যা তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে আর দোয়ার মাধ্যমেই বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়। আপনার উপদেশের বিন্দু বিফলে যাবে এবং আশে পাশের পিপাসার্ত ভূমি উহাকে আত্মস্থ করে উহার চিহ্নও অবশিষ্ট রাখবে না। হ্যাঁ, যদি দোয়ার সৌভাগ্য উহার লাভ হয় তাহলে অবশ্যই উহা সিন্ধুতে পরিণত হবে। সমগ্র বিশ্বের পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করুন। অতএব দোয়ার মাধ্যমে স্বীয় জন্মভূমিরও সেবা করুন। যালেমদের হাতকে নিবৃত্ত করে মযলুমকে সাহায্য করুন এবং উপদেশ দিতে থাকুন যেন জগতে সত্যতা সমুন্নত হয় আর পরিশেষে মানুষের বোধোদয় হয়।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)]

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৬তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১৫ই জুলাই, ১৯৯৪ : ১৫ই ওফা, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ৩১শে আষাঢ়, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন
সূরা আলে ইমরান-৩

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছে, তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

৬৭। দেখ! তোমরাইতো সেই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান (৪২৭) নাই? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৬৮। ইব্‌রাহীম ইহুদীও ছিল না, এবং খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল (আল্লাহ্‌র প্রতি) সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী, এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৯। নিশ্চয় ইব্‌রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধবিশিষ্ট লোক তাহারাই যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং (তাহার উপর) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ মোমেনগণের অভিভাবক।

৭০। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আকাঙ্খা করে, হায়! যদি তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট (৪২৭-ক) করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করে না।

৪২৭। ইব্‌রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত বিবরণ নিয়া, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষে ঝগড়া-বিবাদ করা মোটেই সমীচীন নহে। কেননা, তিনি তো তওরাত ইঞ্জীল আসার বহু পূর্বেই গত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে ঐ দুইটি গ্রন্থে পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধও নাই।

৪২৭-ক। ইসলামের সরলতা, স্পষ্টতা ও পরিপূর্ণতা আহলে-কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টানদের) মনে এমন প্রশংসার উদ্রেক করে যে, তাহারা ইহার দিকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণতা ও শত্রুভাবাপন্নতার কারণে, তাহাদের এই আকর্ষণ বিচিত্ররূপ ধারণ

৭১। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষী? (৪২৭-খ)

৭২। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বুঝিয়া (৪২৭-গ) সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর? রুকূ ৭

৭৩। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে একদল বলে, 'ঈমান আনিয়াছে যাঁহারা তাহাদের উপর যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে অস্বীকার কর, যেন তাহারা ফিরিয়া (৪২৮) আসে;

করে এবং মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে তাহাদের ইচ্ছা হয়, মুসলমানেরাও যদি তাহাদেরই মত হইত।

'যালালা' শব্দটিকে 'ধ্বংস' অর্থে গ্রহণ করিলে (৪০ : ৩৫) 'ইউযিল্লূনাকুম' (তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে চায়)-এর অর্থ দাঁড়াইবে 'তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে চায়'। এইরূপ অর্থের ক্ষেত্রে, পরবর্তী বাক্যাংশ-'ওয়া মা ইউযিল্লূনা ইল্লা আন্‌ফুসাহুম'-এর অর্থ দাঁড়াইবে, 'মুসলমানকে ধ্বংস করিতে যাইয়া তাহারাই ধ্বংস হইয়া যাইবে'।

৪২৭-খ। আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা জঘন্য অপরাধ। কিন্তু তাহার জন্য ইহা অধিকতর জঘন্য, যে নিজে ঐ নিদর্শনের সাক্ষী হইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

৪২৭-গ। আহ্‌লে-কিতাবগণের ধর্মগ্রন্থগুলিতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলির আলোকে বিচার করিলে তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিত যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই সেই প্রতিশ্রুত নবী। কিন্তু ঈর্ষা ও শত্রুতার মনোভাব, ঔদ্ধত্য ও পূর্ব-ধারণা তাহাদের সত্য-গ্রহণের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ করিয়া, অমিশ্র সত্যকে বর্জন করিল।

৪২৮। ইহুদীদের ধর্মজ্ঞানের জন্য, পৌত্তলিক আরবেরাও তাহাদিগকে সম্মানের চোখে দেখিত। এই অবস্থার সুযোগ নিয়া, ইহুদীরা দুরভিসন্ধি করিল যে, দিনের সকাল বেলা তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে এবং দিনের শেষ দিকে তাহারা ইহা ত্যাগ করিবে। এইরূপভাবে কিছু দিন চলিলে, ইসলাম গ্রহণকারী সরলমনা আরবেরা মনে করিবে, ইসলামের মাঝে নিশ্চয় গুরুতর কোনও দোষ আছে, তাহা না হইলে এই ইহুদী আলেমগণ তাহা গ্রহণপূর্বক এত তাড়াতাড়ি বর্জন করিলেন কেন? কিন্তু পরিতাপ ইহুদী ওলামাদের জন্য! তাহারা বুঝিতে পারে নাই, কী ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়া মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে, জ্যোতির্ময় হইয়া গিয়াছিল তাহাদের হৃদয়! তাহারা আর কি কখনও অন্ধকারে ফিরিতে পারে?

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

ভ্রাতৃত্ব

কুরআন :

واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ه (ال عمران ايت ١٠٣)

অর্থাৎ স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করলেন এবং তোমরা তাঁরই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।

হাদীস :

مثل المومنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (مسلم)

অর্থাৎ হুযুর নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, পরস্পরের ভালোবাসা রহম ও স্নেহের ব্যাপারে মুমেনের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায় যেমন কিনা দেহে কোন আঘাত পেলে ঘুম হয় না ও সকল দেহ ব্যথা অনুভব করে (মুমেন পরস্পরের জন্যে তেমন)।

ব্যাখ্যা : খোদাতা'লা মানবজাতিকে খোদামুখী করার জন্যে নবী ও পরবর্তীতে খলীফাদের দ্বারা ঐশী-ব্যবস্থা স্থাপন করে থাকেন। এই ঐশী-ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানবজাতিকে একহাতে একত্রিত করে জান্নাত সদৃশ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এরূপ সমাজের জন্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই চেতনা বোধ দ্বারাই মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে, এক হাতে সমবেত হয়। আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের বিক্ষিপ্ত পদচারণাকে দূরীভূত করে আমিই তোমাদের মাঝে প্রীতির সঞ্চার ঘটিয়েছি পরস্পরের জন্যে এই সহানুভূতির ফলেই তোমরা ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছে। এই ভ্রাতৃত্ব খোদার এক নেয়ামত।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেন, যারা খোদার এই অনুকম্পার অধিকারী হন তাদের জীবনে এই প্রেম-প্রীতি পারলক্ষিত হয়। তারা এক দেহের ন্যায় হয়ে যায় এবং তাদের কেউ কষ্ট পেলে বা ব্যথিত হলে গোটা জাতিই ব্যথা অনুভব করে। আজ আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'ত অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই একমাত্র এই অনুভূতির অধিকারী। আমরা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্যে সমানভাবে ব্যথা অনুভব করি; তারা বসনিয়ার মুসলমান হোক অথবা প্যালেষ্টাইনের।

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমরা সবাই যেন এমনই এক দেহতে রূপান্তরিত হতে পারি। এর জন্যে প্রয়োজন স্নেহ ও ভালোবাসা যদ্বারা আমরা জগৎ বিজয় করতে পারবো। আল্লাহ্ করুন আমরা গোটা বিশ্বের আহমদী তথা মুসলমানদের জন্যে এই স্নেহ ও ভালোবাসা অনুভব করি, যেন গোটা মুসলিম বিশ্ব এক হৃদয়ে পরিণত হয় ও আমরা এক দেহ এক মন হয়ে যাই। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৫৫তম বর্ষের ২৩ ও ২৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

একইভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে সাত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুর্ভিক্ষে গরীবরাই মারা গিয়াছিল। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও দুঃখদানকারী বড় বড় সর্দারেরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শাস্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মুদ্দাকথা, আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে জারী আছে যে, যখন কেহ খোদার তরফ হইতে আগমন করে এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা হয় তখন বিভিন্ন ধরনের বিপদ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ লোকেরা পাকড়াও হয়, যাহাদের এই অস্বীকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব ধীরে ধীরে কাফেরদের নেতাদিগকে পাকড়াও করা হয় এবং সর্বশেষে বড় পাপিষ্ঠদের পালা আসে। ইহার প্রতি আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াতে ইঙ্গিত করেন, افلا نأتى الارض ننقصها من اطرافها (সূরা আল রা'দ—আয়াত ৪২)। অর্থাৎ আমি ধীরে ধীরে যমীনের দিকে আসিতে থাকি। আমার এই বর্ণনায় কোন কোন ঐ সকল নির্বোধের আপত্তির উত্তর আছে, যাহারা বলে কাফের ফতোয়াতো মৌলবীরা দিয়াছিল। কিন্তু প্লেগে মারা গেল গরীব লোকেরা এবং কাংড়া ও ভাগচুর পাহাড়ী এলাকার শত শত লোক ভূমিকম্পে বিনাশ হইয়া গেল। তাহাদের কী অপরাধ ছিল? তাহারা কীভাবে অস্বীকার করিয়াছিল? অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন খোদার কোন রসূলকে অস্বীকার করা হয়—ঐ অস্বীকার কোন বিশেষ জাতি করুক বা পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশের লোকেরা করুক না কেন—তখন খোদাতা'লার আত্মাভিমান সাধারণ শাস্তি অবতীর্ণ করে এবং আকাশ হইতে সাধারণভাবে বিপদাবলী অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ সময় এইরূপ হয় যে, প্রকৃত অপরাধী, যে ফাসাদের গোড়া, তাকে পরবর্তী সময়ে পাকড়াও করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, হযরত মূসা ফেরাউনের সামনে কিছু ভয়ঙ্কর নিদর্শন দেখাইয়া ছিলেন। ফেরাউনের কোন ক্ষতি হয় নাই। কেবল গরীবরা মারা গিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে খোদা ফেরাউনকে তাহার বাহিনীসহ ডুবাইয়া ছিলেন। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান, যাহা কোন ওয়াকেবহাল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না।

প্রশ্ন (৬)

হুযূরে আলী হাজার হাজার জায়গায় লিখিয়াছেন যে, কলেমা-বিশ্বাসীকে ও আহলে কেবলাকে কাফের বলা কোন মতেই ঠিক নহে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল মোমেন যাহারা আপনাকে কাফের আখ্যা দিয়া নিজেরা কাফের হইয়া যায় তাহারা ছাড়া কেবল আপনাকে না মানার দরুন কেহ কাফের হইতে পারে না। কিন্তু আবদুল হাকিম খানকে আপনি লেখেন যে, যাহাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করে নাই তাহারা মুসলমান নহে। এই বর্ণনা ও পূর্বে আপনি তরিয়াকুল কুলুব ও অন্যান্য পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আমাকে না মানার দরুন কেহ কাফের হয় না। কিন্তু আপনি এখন লিখিতেছেন যে, আমাকে কেহ অস্বীকার করিলে সে কাফের হইবে।

উত্তর ঃ ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, আপনি কাফের আখ্যাদানকারী ও অমান্যকারীকে দুই ধরনের মানুষ মনে করেন। অথচ খোদার নিকট তাহারা একই ধরনের মানুষ। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে মানেনা সে এই কারণে মানে না যে, সে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, খোদা সম্পর্কে যাহারা মিথ্যা বানাইয়া বলে তাহারা সব চাইতে বড় কাফের, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوكذب بايٰته ط

(সূরা আল্‌-আরাফ, আয়াত ৩৮)। অর্থাৎ বড় কাফের দুইটিই আছে। প্রথমটি হইল, যে খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বলে * এবং দ্বিতীয়টি হইল, যে খোদার কালামকে অস্বীকার করে। অতএব যে ক্ষেত্রে একজন অস্বীকারকারীর দৃষ্টিতে আমি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছি, সেক্ষেত্রে আমি কেবল কাফেরই নই, বরং বড় কাফের। যদি আমি মিথ্যাবাদী না হই তবে নিঃসন্দেহে ঐ কুফরী তাহাদের উপর পড়িবে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই উপরোক্ত আয়াতে বলেন। এতদ্ব্যতীত যে আমাকে মানেনা সে খোদা ও রসূলকেও মানে না। কেননা আমার সম্পর্কে খোদা ও রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়াছিলেন যে, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্য হইতেই মসীহ মাওউদ আসিবেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সংবাদও দিয়াছিলেন যে, আমি মে'রাজের রাত্রিতে মসীহ ইব্‌নে মরিয়মকে ঐ সকল নবীর মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছি যাহারা এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইয়াহিয়া শহীদের পাশে

---

* টিকা :—এখানে যালেমের অর্থ কাফের। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলার মোকাবেলায় অস্বীকারকারী আল্লাহ্‌র কিতাবকে যালেম সাব্যস্ত করিয়াছে এবং নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি খোদাতা'লার কালামকে অস্বীকার করে সে কাফের। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। এই জন্য আমাকে কাফের বলার দরুন সে নিজেই কাফের হইয়া যায়।

দ্বিতীয় আকাশে তাঁহাকে দেখিয়াছি। খোদাতা'লা কুরআন শরীফে সংবাদ দিয়াছেন যে, মসীহ ইব্‌নে মরিয়ম মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। খোদা আমার সত্যতার সাক্ষ্যরূপে তিন লক্ষের অধিক আসমানী নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। রমযানে আকাশে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছে। এখন যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের কথা মানে না, কুরআনকে অস্বীকার করে, সজ্ঞানে খোদাতা'লার নিদর্শনসমূহ রদ করে, এবং শত শত নিদর্শন সত্ত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, সে কীভাবে মোমেন হইতে পারে? যদি সে মোমেন হয় তবে মিথ্যা বলার দরুন আমি কাফের সাব্যস্ত হই। কেননা তাহাদের দৃষ্টিতে আমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, قالت الاعراب امنا ط قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم (সূরা আল্‌ হুজুরাত : আয়াত ১৫)।

অর্থাৎ আরবের গ্রামবাসীরা বলে আমরা ঈমান আনিয়াছি। তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা ঈমান আন নাই। হ্যাঁ, এইরূপ বল যে, আমরা অনুবর্তিতা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি; কিন্তু ঈমান এখনো তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। অতএব যে স্থলে খোদা অনুবর্তিতাকারীদের নাম মোমেন রাখেন না, সে স্থলে ঐ সকল লোক কীভাবে খোদার নিকট মোমেন হইতে পারে যাহারা প্রকাশ্যে খোদার কালাম অস্বীকার করে এবং যমীনে ও আকাশে খোদাতা'লার হাজার হাজার নিদর্শন দেখিয়াও আমাকে অস্বীকার করা হইতে বিরত হয় না? তাহারা নিজেরাও এই কথা স্বীকার করে যে, যদি আমি খোদার নামে মিথ্যা কথা না বলি এবং মোমেন হই তবে এমতাবস্থায় আমাকে অস্বীকার করার ও কাফের বলার দরুন তাহারা কাফের হইয়াছে এবং আমাকে কাফের আখ্যায়িত করিয়া নিজেদের কুফরীর উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছে। ইহা শরীয়তের একটি বিধান যে, মোমেনকে কাফের বলে সে পরিণামে কাফের হইয়া যায়। দুইশত মৌলবী আমাকে কাফের আখ্যা দিয়াছে এবং আমার উপর কুফরীর ফতোয়া লিখিয়াছে। তাহাদের ফতোয়া দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয় যে, যে মোমেনকে কাফের বলে সেও কাফের হইয়া যায়। তাহা হইলে এই বিষয়টির সহজ প্রতিকার এই যে, যদি অন্যান্য লোকদের মধ্যে সত্যতার বীজ ও ঈমান থাকে এবং তাহারা মোনাফেক না হয়। তবে তাহাদের এই সকল মৌলবীর প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্বক এই বলিয়া একটি লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপানো উচিত যে, ইহারা সকলে কাফের। কেননা ইহারা একজন মুসলমানকে কাফের বানাইয়াছে। তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে মুসলমান মনে করিব—অবশ্য যদি তাহাদের মধ্যে মোনাফেকী না পাওয়া যায় এবং তাহারা খোদার সুস্পষ্ট মোজেযাসমূহের অস্বীকারকারী না হয়। নতুবা আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار (সূরা আল্‌-নেসা —আয়াত ১৪৬)। অর্থাৎ মোনাফেকদিগকে দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে।

হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, مازنازان و هو مؤمن وما سرق سارق و هو مؤمن * অর্থাৎ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারের অবস্থায় এবং কোন চোর চুরির অবস্থায় মোমেন হয় না। তাহা হইলে মোনাফেক মোনাফেকীর অবস্থায় কীভাবে মোমেন হইতে পারে? যদি এই বিধান সত্য না হয় যে, কাহাকেও কাফের বলিলে মানুষ নিজেই কাফের হইয়া যায় তবে তোমাদের মৌলবীদের ফতোয়া আমাকে দেখাইয়া দাও আমি গ্রহণ করিয়া লইব। কিন্তু যদি কাফের হইয়া যায় তবে দুইশত মৌলবীর কুফরী সম্পর্কে তাহাদের নামে নামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করিয়া দাও। ইহার পর তাহাদের ইসলামের সন্দেহ করা আমার জন্য হারাম হইবে। অবশ্য ইহার জন্য শর্ত এই যে, তাহাদের মধ্যে কোন মোনাফেকীর স্বভাব থাকা উচিত হইবে না □।

প্রশ্ন (৭)

দাওয়াত পৌঁছিয়া যাওয়া বলিতে কি বুঝায়?

উত্তর: দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছে সে লোকদেরকে অবহিত করিবে যে, আমি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছি এবং তাহাদিগকে তাহাদের ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিবে যে, অমুক অমুক আমলের ক্ষেত্রে তোমরা উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল প্রমাণ দ্বারা নিজের সত্যতা প্রমাণ করিবে। আল্লাহ্‌র বিধান এইরূপ যে, তিনি প্রথমে স্বীয় নবীগণকে ও রসূলগণকে এতখানি অবকাশ দেন যে, তাঁহাদের নাম পৃথিবীর অনেক অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হইয়া যায়। তাহাছাড়া আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল প্রমাণসহ তাঁহারা লোকদের উপর 'হুজ্জত' (দলিল প্রমাণ সহ কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করা) কায়েম করেন। তাহাদিগকে পৃথিবীতে অসাধারণ খ্যাতি দান করা এবং উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সহিত হুজ্জত কায়েম করা খোদাতা'লার নিকট অসম্ভব কাজ নহে। যেমন তোমরা দেখিতেছ, যে মুহূর্তে আকাশের এক প্রান্তে বিদ্যুৎ চমকাইল এবং অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া গেল, তেমনি খোদার আদেশে খোদার রসূলগণকে খ্যাতি দান করা হয় এবং খোদার ফেরেশ্‌তাগণ যমীনে অবতীর্ণ হন এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে এই কথা প্রবিষ্ট করিয়া দেন যে, তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহা সঠিক নহে। তখন এইরূপ লোক সঠিক পথের অন্বেষণে লাগিয়া যায়। অন্যদিকে খোদাতা'লা এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন

---

* টিকা: সহীহ বোখারীতে এই অর্থের রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণিত আছে: "কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না মোমেন হওয়া অবস্থায় এবং চুরিও করে না মোমেন হওয়া অবস্থায়"।

□ টিকা: আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, কাফেরকে মোমেন আখ্যা দিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। কেননা যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কাফের সে তাহার কুফরী অস্বীকার করে। আমি দেখিতেছি, যে সকল লোক আমার উপর ঈমান আনে না তাহাদের সকলে এইরূপ ব্যক্তি যাহারা ঐ সকল লোককে মোমেন মনে করে যাহারা আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। অতএব আমি এখনো আহলে কেবলাকে কাফের বলি না। কিন্তু নিজেদের হাতেই নিজেদের দরুন যাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে আমি কীভাবে মোমেন বলিতে পারি?

যে, যুগ ইমামের সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছিয়া যায়। বিশেষভাবে এই যুগতো এইরূপ যুগ যে, কয়েক দিনের মধ্যে বদনামীর সহিত একটি নামী ডাকাতের নামও পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তবে, খোদাতা'লার বান্দা, যাহার সহিত সর্বদা খোদা আছেন তাহার নাম কি এই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না? তিনি কি গুপ্ত থাকিবেন? তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ার ব্যাপারে কি খোদা শক্তিমান নহেন? * আমি দেখিতেছি খোদাতা'লার ফযল এইরূপে আমার সাথে আছে যে, আমার জন্য 'হুজ্জত' কায়েমের নিমিত্তে এবং স্বীয় নবী করীমের ধর্ম প্রচারের জন্য খোদাতা'লা ঐ সকল উপকরণ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ আমার সময়ে ট্রেন, তার, ডাক ব্যবস্থা এবং স্থল ও জল পথে যাতায়াত ব্যবস্থার দরুন বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এখন সকল দেশ যেন একই দেশ হইয়া গিয়াছে, বরং একই শহরে পরিণত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমণ করিতে চাহে তবে অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পুস্তক লেখা খুব সহজ সরল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যে সকল বিশাল গ্রন্থের কয়েক কপি এক শত বৎসরেও লেখা যাইত না ইহাদের কয়েক লক্ষ কপি এখন দুই এক বৎসরে লেখা যায় এবং সকল দেশেই মুদ্রিত করা যায়। সব দিক হইতে তবলীগের জন্যও এত সহজ উপায় ও উপকরণের উদ্ভব হইয়াছে যে, আমাদের দেশে আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে ইহাদের নাম নিশানা ছিল না। আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বেকার সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ ছিল। কিন্তু এখন মাদ্রাসার আধিক্যের দরুন, যাহা গ্রামাঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, লোকদের জ্ঞানের পরিধি এতখানি বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহারা ধর্মীয় পুস্তকাদি সহজে বুঝিতে পারে। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

---

* টিকা :—আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদাতা'লার এই ইলহাম আমার সম্পর্কে মজুদ আছে। ইহা ঐ যুগের ইলহাম যখন আমি গোপনে জীবন যাপন করিতেছিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া কেহ আমাকে চিনিত না। ঐ ইলহামটি এই যে, انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى فحان ان تعان وتعرف بين الناس অর্থাৎ তুমি আমার তওহীদ ও একত্বের তুল্য। অতএব ঐ সময় আসিয়া গিয়াছে যে, তোমাকে সর্ব প্রকারের সাহায্য প্রদান করা হইবে। পৃথিবীতে তোমার নাম সম্মানের সহিত ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। নাম ছড়াইয়া দেওয়ার ওয়াদা তওহীদ ও একত্বের সহিত উল্লেখ করা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, প্রতাপ ও সম্মানের সহিত নাম ছড়াইয়া পড়ার প্রকৃত অধিকার এক ও অদ্বিতীয় খোদার। অতঃপর যাহার উপর খোদাতা'লার বিশেষ ফযল হয় সে কেবল আত্ম-বিলীনতার দরুন খোদাতা'লার তওহীদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্য হইতে দ্বৈততা তিরোহিত হইতে থাকে। তখন খোদাতা'লা এইভাবে তাহার নাম, সম্মান, প্রতাপ ও মহিমার সহিত ছড়াইয়া দেন, যেমন তিনি নিজের নামকে ছড়াইয়া দেন। কেননা তওহীদ ও একত্ব এই অধিকার সৃষ্টি করে যে, সে এইরূপ সম্মান লাভ করিবে।

জুমু'আর খুতবা

(সার সংক্ষেপ)

[১৮ই জুলাই '৮৬ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

"রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজ্জত ও আব্রুর হেফাযত"-এর নামে পাকিস্তানে প্রণীত আইনের শরীয়তের কষ্টি-পাথরে মূল্যায়ন ও অবস্থান সম্বন্ধে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পর্যালোচনা ঃ

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা আনআমের ১০৯ নং আয়াত এবং সূরা আল-আহযাবের ৫৭-৫৯ নং আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন। আয়াতসমূহের তরজমা নিম্নরূপ :

"তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে (দোয়া ও আরাধনায়) আহ্বান করে তাহাদিগকে গালি দিও না, অন্যথায় তাহারা শত্রুতার বশবর্তী হইয়া অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্কে গালমন্দ দিবে। অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট তাহাদের আমল (কর্মকাণ্ড) সুশোভিত করিয়া দেখাইয়া থাকি। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তখন তিনি তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।" (আল্-আনআম : ১০৯)

"নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর তাঁহার অজস্র করুণা ও রহমত বর্ষিত করিতেছেন। এবং (সেই সঙ্গে) তাঁহার ফিরিশতাগণও (নিশ্চয় তাহার জন্য দোয়া করিয়া চলিয়াছে ; অতএব,) হে মুমেনগণ। তোমরাও এই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং তাহার জন্য দোয়া করিতে থাক এবং (অত্যন্ত জোশ ও উদ্দীপনার সহিত) তাহার জন্য শান্তি ও সালামতি যাচ্ঞা করিতে থাক।

ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে কষ্ট দেয় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালে এবং পরকালে তাঁহার নৈকট্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন, এবং তিনি তাহাদের জন্য অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ঐ সকল লোক যাহারা মুমেন পুরুষ ও মুমেনা স্ত্রীলোকদিগকে—ইহা ব্যতিরেকেই যে তাহারা কোন দোষ বা অপরাধ করিয়াছে—কষ্ট দেয়, ঐ সকল লোক ভয়ানক মিথ্যা এবং খোলাখুলি গোনাহর বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে।" (আল্-আহযাব ৫৭-৫৯)

"নামুসে-রাসূলের হেফাযত" সংক্রান্ত আইন ঃ

অতঃপর হুযুর বলেন, আমল বা কর্মগত সৌন্দর্য ও বিমলতার ভিত্তি ভাল ভাল আকাঙ্খা এবং ভাল ভাল দাবী আওড়ানোর উপর নির্ভরশীল নয় বরং এরূপ নেক নিয়্যতের

উপরে নির্ভরশীল, যা কিনা সুবিমল আমল ও কর্মধারায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেক সময় মানুষ ভাল ভাল দাবীকেই তার নাজাত বা পরিত্রাণের উপায় ও মাধ্যম মনে করে নেয় এবং ভাল ভাল দাবীকে (মানুষের নিকট) সে তার কর্মকাণ্ডকে সুন্দর বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে একটি উপায় হিসেবে অবলম্বন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা মানুষের আমল বা কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষণ করি, তখন অনেক সময়েই দেখা যায় যে, খুব বড় বড় নেক দাবী নেক আমলের প্রতিফলন ঘটাবার পরিবর্তে বরং এমন সব কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়, যে সব কার্যকলাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সেজন্য নিছক দাবী অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য। আসল সত্য ও সারবস্তু ঐ নিয়্যতের মধ্যেই নিহিত, যা মানুষের আমল বা কর্মধারার পিছনে সক্রিয় হয়ে থাকে।

হুযুর বলেন, আজকাল পাকিস্তানে এই ধরনেরই একটি ভাল ও নেক দাবী উচ্চারণ করা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার চিত্তাকর্ষক নামের ভিত্তিতে এবং ঐ দাবীর ফলশ্রুতিতে সেই দেশে একটি আইনও পাশ করা হয়েছে। সেটি হলো "নামুসে-রসূলের হেফাযত"-এর কানুন। বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের এতই প্রেম ও ভালবাসা রয়েছে যে, তাঁর কোন প্রকারের অবমাননা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। সেজন্য যে ব্যক্তিই এইরূপ অবমাননাকারী বলে সাব্যস্ত হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে অথবা ন্যূনকল্পে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া যাবে।

এক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কেন আইন নয়?

হুযুর (আইঃ) উক্ত দাবীর শরীয়তগত মূল্যায়ন ও অবস্থানের উপর আলোকপাত করে বলেন যে, কুরআন করীমের শিক্ষা সুস্পষ্ট। তা হলো এই যে, সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌তা'লার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, অলীক ও মিথ্যা খোদাদেরকেও গালি দিও না, যেগুলি কিনা কল্পিত ও ঘৃণ্য বস্তু। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ্‌র ভালবাসাকেই নিরূপণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারো অন্তরে যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা থাকে তা'হলে তাঁর প্রতি ভালবাসার খাতিরে সে যেন গায়রুল্লাহ্ (অর্থাৎ মিথ্যা মাবূদদেরকেও) গালি না দেয়, কেননা গায়রুল্লাহ্‌কে গালি দিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এবং গায়রুল্লাহ্ (তাহাদের ভক্তরা) উহার বিনিময়ে তার প্রিয় ও সম্মানিত প্রভুকে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করবে।

হুযুর বলেন, যে জিনিসটি অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিকেই অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হচ্ছে। রসূলের ইজ্জত খোদাতা'লার মাধ্যবর্তিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলের সত্তা তো খোদাতা'লার ভালবাসার ফলশ্রুতিতে রূপায়িত হয়। যদি খোদার ভালবাসা না থাকে এবং

তাঁকে যদি কোন সম্মান ও মর্যাদা না দেয়া হয় তাহলে রেসালতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অতএব, কুরআন করীম যেখানে সম্মান-সম্ভ্রমের কথা উল্লেখ করেছে এবং উহার খাতিরে মনে আঘাত বা কষ্ট দেয়া থেকে বারণ করেছে, সেখানে আল্লাহ্‌তা'লার সত্তাকে চিহ্নিত করেছে, যিনি কিনা সবকিছুর ভিত্তি এবং প্রত্যেক (প্রকার) নূরের উৎস। তাঁর নিকট থেকেই প্রতিটি সত্য প্রস্ফুটিত হয় এবং তাঁর মাধ্যমে সকল ইজ্জত ও সম্ভ্রমের উদ্ভব ঘটে ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর বলেন, (পাকিস্তানের) ঐ কানুনটি আমার নিকট অদ্ভুত বলে ঠেকেছে—এজন্যে যে, রসূলের সম্মান ও সম্ভ্রমের কথা তো বলা হচ্ছে, কিন্তু সেই রসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁর সারাটা জীবন ও সমস্ত সত্তা আল্লাহ্‌তা'লার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতেই নিবেদিত ছিল, তাঁর সেই প্রিয় ও প্রেমাস্পদ (খোদাতা'লা)-এর কোন উল্লেখই নেই। সেই প্রভু ও মওলা, একক ও ওয়াহেদ খোদার ইজ্জত ও সম্মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোন কানুন নেই।

নামুসে-রসুলের হেফাযতের জন্য সকল ধর্মের প্রবর্তক ও প্রধানদের সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা জরুরী ঃ

হুযুর বলেন, উক্ত কানুন পাশ করতে গিয়ে উল্লিখিত আয়াত থেকে এই হিকমত ও প্রজ্ঞার কথাটিও তারা শিখলো না যে, কুরআনী নীতিমালার আলোকে যদি তোমরা প্রকৃত-পক্ষেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে ভালবেসে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কামনা কর, তাহলে ব্যাপারটি এইভাবে শুরু কর যে, বর্তমান জগতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মোকাবিলায়—ইসলাম ব্যতীত যতগুলি ভিন্ন ধর্ম রয়েছে—সেগুলির সত্যাসত্যের কথাতো দুরে থাক—যেগুলিকে তোমরা নিজেরা মিথ্যা বলে মনে কর, সে সকল ধর্মের প্রবর্তক ও প্রধানদেরও সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দাও; তাদের সম্মান-সম্ভ্রম (হেফাযত) সম্পর্কে কানুন পাশ কর, এই কথার ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে, হযরতে আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ) কে তোমরা সত্যিকারভাবে ভালবাস এবং তোমরা এটা বরদাস্ত করতে পার না যে, পাছে কেউ কোন ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রধানের সম্মানে আঘাত দেয়ার ফলশ্রুতিতে (তাঁর ধর্মাবলম্বীরা) হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অমর্যাদা ও অবমাননায় প্ররোচিত হয়। হুযুর বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাদের ভালবাসার দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে কুরআন করীমের নীতি অনুযায়ী প্রথমে এই কানুন পাশ হওয়া উচিত যে, এই দেশে আমরা কোন ধর্মনেতারই অসম্মান ও অমর্যাদা করার অনুমতি দিব না, সে ধর্মনেতা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। কেননা এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা আছে যে, আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে (ভিন্নধর্মাবলম্বীদের) ভাবানুভূতি উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে এবং তাদের মুখ দিয়ে কোন মর্যাদাহানিকর কথা বের হতে পারে।

রসুল করীম (সাঃ)-এর অমর্যাদাকারীদের শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার ঃ

হুযূর বলেন, যতদূর হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শানের অমর্যাদা করার ব্যাপার, সে প্রসঙ্গে কুরআন করীমে বিপুলভাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঐ সকল আয়াত পাঠে এ আশ্চর্যকর কথাটি সামনে আসে যে, পবিত্র কুরআনের কোন একটি স্থানেও মানুষকে এই এখতিয়ার বা ক্ষমতা দান করা হয়নি যে, ঐ সকল অমর্যাদা-কারীদেরকে ইহজগতেই শাস্তি দেয়া হোক। [হযরত নবী করীম (সাঃ) ও মুমেনদের] অবমাননা ও অমর্যাদা এবং কঠোর মনঃকষ্ট দেয়ার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বহু উল্লেখ আছে কিন্তু কোন একটি স্থলেও আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে এই এখতিয়ার বা অধিকার দান করেন নি যে, তাঁর প্রিয় বান্দাদের অমর্যাদা ও অবমাননার ফলশ্রুতিতে তারা অবমাননা-কারীদেরকে শাস্তি দিবে। বরং এই শাস্তিদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের জিম্মায় তুলে নিয়েছেন। নিজেই উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এই দুনিয়াতে আমিই তাদেরকে লাঞ্ছিত করবো এবং আখেরাতেও। তারপর হুযূর (আইঃ) কুরআনী আয়াতের আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অবমাননা ও অভিযোগকারীগণ মজুদ ছিল এবং খোদাতা'লা তাদেরকে চিহ্নিতও করে দিয়েছিলেন যে, এরা হলো রসূল (সাঃ)-এর অমর্যাদা ও অবমাননাকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জন্য দুনিয়ায় কোন এরূপ শাস্তি আল্লাহ্‌তা'লা নির্ধারণ করেননি, যা প্রয়োগ করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। হুযূর বলেন, এরূপ হতভাগ্যরাও ছিল, যারা হুযুর পাক (সাঃ)-এর শানে সর্বদা অপমানজনক ও অমর্যাদাকর উক্তি করতো কিন্তু খোদাতা'লা ইহা বলেননি যে, উঠ! এবং এদেরকে হত্যা করে দাও, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাও, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত কর, তাদের বাড়ী ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও। বরং আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, তাদের জন্য আখেরাতের আযাব নির্দিষ্ট আছে। হুযূর বলেন, যে কুরআনী আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে সে সবগুলিতে ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সেখানে মুসলমান সোসাইটি বা সমাজের উল্লেখ আছে এবং তাদেরকে উপদেশ দান করা হচ্ছে যে, তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অমর্যাদা ও অব-মাননা থেকে বিরত হও। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুসলমান সোসাইটিতে এরূপ মুনাফেক মজুদ ছিল যাদের সম্বন্ধে মুসলমান সোসাইটি অবহিত ছিল যে, এরা চরিত্রহীন ও বেআদব-উশৃংখল লোক আর এদের ঈমান অন্তঃসারশূন্য। হুযুর বলেন, (পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে) এইসব কথার উল্লেখ মজুদ রয়েছে। কিন্তু কোন একটি স্থানেও (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল) এ কথা বলেননি যে, তাদেরকে হত্যা কর ও নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নাও, তাদেরকে জীবিত থাকার কোন অধিকার

দিও না। এই প্রসঙ্গে হুযুর (আইঃ) মুনাফেকদের সরদার আবদুল্লাহ্ বিন আবি সলুলের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সাথে সে বার বার বেয়াদবী ও অবমাননা করা সত্ত্বেও তিনি তার পুত্রকে ধৈর্য ধারণের জন্য তাকিদ করেন।

শরীয়তে হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চাকারীগণই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জঘন্য সম্মানহানিকারী ঃ

হুযুর (আইঃ) বলেন, যদি কুরআন করীমের স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান থাকতো যে, নবীর মানহানির কারণে তাঁর জাতির জন্য মানহানিকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরিহার্য ও বাধ্যকর তাহলে কি সেই আদেশটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জ্ঞানগোচর হয়নি? আজ চৌদ্দশ' বছর পর পাকিস্তানের মোল্লারাই সেটি জ্ঞাত হলো!। অর্থাৎ শরীয়ত দানকারী (আল্লাহ্তা'লা) তো শরীয়ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে প্রদান করলেন এবং উহার অন্তর্নিহিত সকল জ্ঞান ও হিকমত দান করলেন, কিন্তু তিনি তো উক্ত বিষয়টি বুঝতে পারলেন না এবং অধুনা মোল্লাগণ বুঝতে পারলো যে, আসল শরীয়ত হলো এই এবং এটাই শরীয়তের হুকুম!! হুযুর বলেন যে, বস্তুতঃ এটাই হলো হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ মানহানি। হুযুর বলেন, যদি মানহানির শাস্তি বস্তুতঃ থেকে থাকে, তাহলে উহা ঐ সকল মানহানিকারী উদ্ধত ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য, যারা তাঁকে (সাঃ) ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার দাবীদার এবং যারা শরীয়তে হস্তক্ষেপ ও খোদকারীর কাজ নিজেদের হাতে নিয়েছে এবং নিজেদেরকে খোদায়ীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। হুযুর বলেন, পাকিস্তানে বিভিন্ন ফের্কা ও সম্প্রদায়কে তারা ইহাই বলেছে যে, আহমদীদেরকে (সুকৌশলে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমরা এই হাতিয়ারটি তৈরী করেছি যে, তামাদের এতে ভয় পাওয়ার কি প্রয়োজন? আহমদীদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত আব্রু এ আইনের দ্বারা সকলের জন্য হালাল করে দিবো। হুযুর বলেন, এই দুরভিসন্ধি তারা পরস্পরে এঁটেছে, কিন্তু এ চক্রান্ত এখানেই ক্ষান্ত হবে না। বরং যতদূর এ সকল ফের্কা ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তারা নিজেরা একে অন্যের উপর রসূল (সাঃ)-এর প্রতি অবমাননায় দোষারোপ করে থাকে। (কাজেই) উক্ত, কানুনের ফলশ্রুতিতে সে দেশে এত অশান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে যে, একে অন্যের প্রতি রসূল (সাঃ)-এর অবমাননার দোষারোপ করে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করবে। যে দেশে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নিয়ে চাপরাসী পর্যন্ত সকলেই মিথ্যা কথা বলে সেখানে কারও উপর মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করাটা তো কোন কঠিন কাজই নয়।

সত্যিকার গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যে পার্থক্য করে না ঃ

হুযুর বলেন, প্রকৃত ভালবাসার দাবী ও চাহিদা হলো কোরবানী ও আত্মত্যাগ এবং ইহা এমন এক গায়রত সৃষ্টি করে থাকে যে, দুর্বল অথবা শক্তিশালীর পার্থক্য বাকী রাখে

না। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কারো জন্য প্রকৃত ভালবাসা ও গায়রত বিদ্যমান থাকে এবং তার এমন মেজায ও স্বভাব হয়ে থাকে যে, সে তাঁর অবমাননা বরদাস্ত করতে পারে না, তা'হলে সে তখন ইহা দেখবে না যে, অবমাননাকারী শক্তিশালী, না দুর্বল। সে তো তার ফলাফল ও পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পদক্ষেপে উদ্যত হয়ে পড়বে। হুযুর বলেন, ইংল্যাণ্ডে এমন সব প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেগুলিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানের ভয়ংকর অবমাননা করা হয়। কিন্তু সব গায়রতওয়ালারাই, যারা কিনা দাবী করে যে, তাদের পক্ষে অবমাননা বরদাস্ত হয় না এবং ইহার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড—এসব গায়রতের দাবীদাররা নিজেদের দেশে আরামসে বসে থাকে। হুযুর বলেন যে, এদের মতাদর্শীরা এখানেও (ইল্যাণ্ডে) মজুদ রয়েছে; তারা আদৌ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, গায়রত ও আত্মমর্যাদাভিমানের দাবী সবই মিথ্যা। হুযুর বলেন, গায়রতের দাবীও আছে, আবার সেই সঙ্গে এই শর্তটিও জড়িত যে, গায়রত তখনই দেখানো হবে যখন অপর ব্যক্তিটা নিতান্ত দুর্বল হবে এবং সে যেন চড়াই ছানার ন্যায় আমাদের থাবার মধ্যে এসে পড়ে। তার ঘাড় তো আমরা মটকাবো কিন্তু শক্তিশালীর মোকাবেলায় আমরা কস্মিনকালেও গায়রত দেখাব না, এমন কি টু শব্দ টুকুও উচ্চারণ করবো না। এ কি ধরনের গায়রত?! এবং কি ধরনেরইবা অকৃত্রিম ভালবাসার দাবী?!

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল (সাঃ)-প্রেম ঃ

হুযুর বলেন, গায়রতের সত্যিকার চাহিদা ও অভিব্যক্তি তো হলো নিজেই নিজেকে কোরবানী দেওয়া, অন্য কাউকে হত্যা করা তো নয়। ভালবাসার ফলশ্রুতিতে মানুষের হৃদয় ব্যথায় জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়। যদি, হৃদয় ব্যথিত না হয় তাহলে ভালবাসার দাবী মিথ্যা। হুযুর বলেন যে, হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণের উক্ত তুলাদণ্ডে যে শানের সহিত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) উত্তীর্ণ হন উহার কোন নজির আর কোথায়ও খুঁজে পাবেন না। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সামান্যতম অমর্যাদা ও মানহানিতেও তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়তো। যত (ইসলামবিদ্বেষী) লোকের সাথে তিনি মোকাবিলা করেছেন সেগুলির মৌলিক কারণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসাই ছিল। আমেরিকায় বসে আলেকজেণ্ডার ডুই যখন অমর্যাদা ও অবমাননা করলো তখন তিনি কাদিয়ানে বসে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন এবং তাকে মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ দিলেন। রাত্রিকালে উঠে উঠে খোদাতা'লার হুযুরে কান্না-কাটি করে আত্মাবিলীন হলেন এবং শান্তি লাভ করতে পারলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতা'লার গায়রতের ছুরি ডুইকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে না ছাড়লো। একে বলে ভালবাসা। তারপর লেখরাম যখন

অবমাননা করলো তখনও সে সিংহ (হযরত মসীহ মাওউদ) তাকে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দোয়ায় নিজেকে আত্মবিলীন করলেন। নিজের খঞ্জরের দ্বারা নয়, বরং নিজের গায়রতকে খোদাতা'লার গায়রতের খঞ্জরে রূপান্তরিত করে (ঐশী নিদর্শনের দ্বারা) তার নিপাত ঘটালেন। আর ঐ মধ্যবর্তী কালটিতে নিজে দুঃখবেদনায় জর্জরিত হয়ে থাকলেন। এই হলো সত্যিকার ভালবাসা এবং মর্যাদাবোধের অভিব্যক্তি, এবং ঐ ভালবাসা ও মর্যাদাবোধই হলো খোদা কর্তৃক তাঁর আদিষ্ট হওয়ার ভিত্তি।

আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা ঃ

হুযুর বলেন, ইহাই আমাদের প্রকৃতিগত স্বভাব। দুনিয়ার কোন শক্তি [নবী করীম (সাঃ)-এর] এই ভালবাসা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না। যদি এই ভালবাসার অপরাধে রসূল-অবমাননার (মিথ্যা অপবাদের) ছুরির দ্বারা আমাদেরকে টুকরো টুকরো করা হয়, তা'হলে আমি আজ সমগ্র জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, যা ইচ্ছা করে বেড়াও মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ভালবাসা আমাদের হৃদয় থেকে খুঁচিয়ে উপরাতে পারবে না, পারবে না। আর আমি ইহাও বলে দিচ্ছি যে, উক্ত ভালবাসা জীবনের রক্ষাকবচ এবং এই ভালবাসার অধিকারীদেরকে কখনও তোমরা দুনিয়াতে অকৃতকার্য সাব্যস্ত করতে পারবে না। তোমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তোমাদের প্রতিটি হীন ও লাঞ্ছিত অপবাদ তোমাদের মুখের উপরই ফিরিয়ে দেয়া হবে। মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভালবাসার অধিকারীদেরকে কখনও তোমরা দুনিয়াতে অকৃতকার্য সাব্যস্ত করতে পারবে না। তোমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভালবাসা জীবিত থাকার জন্যে এবং জীবিত রাখার জন্যে তৈরী হয়েছে। এর দ্বারা যে জীবন আমরা লাভ করে থাকি, এবং চিরকাল লাভ করতে থাকবো, তোমাদের কোন শক্তি নেই যে, সেই জীবনের হৃদপিণ্ডের উপর তোমরা ছোবল মারতে পার। খোৎবা সানিয়াতে হুযুর (আইঃ) কয়েকটি নামাযে-জানাযা-গায়েব সম্বন্ধে ঘোষণা করেন এবং জুমুয়ার নামাযান্তে জানাযা পড়ান। হুযুরের উক্ত খোৎবা প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট কাল স্থায়ী থাকে। ইংল্যাণ্ড জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত মেহমানদের কারণে বিপুল সংখ্যায় বন্ধুগণ মসজিদ ও মিশন হাউসের প্রশস্ত হল এবং বিস্তৃত মাঠে নামায আদায় করেন।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক 'আল-নসর' ১লা আগষ্ট ৮৬ইং সংখ্যা থেকে অনূদিত ও ১৯৮৬ সনের পাক্ষিক আহমদীর ৯ম সংখ্যা থেকে পুনঃ প্রকাশিত)

জামাতের উদ্দেশ্যে
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর
গুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা) ইশার নামাযের পর মসজিদে মোবারকে সমবেত আহ্‌বাবের সম্মুখে জামা'তের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী প্রদান করেন :—

"আমি আপনাদিগকে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করিতে চাই। স্মরণ রাখিবেন, সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি হইল ধৈর্য ধারণের শক্তি যাহা ইলাহী জামাতসমূহকে দান করা হইয়া থাকে। ইহা এমনই শক্তি, যাহার মোকাবিলা কেহই করিতে পারে না।

ধৈর্য মানুষকে দোয়ায় মনোযোগী করে এবং দোয়াতে শক্তির সৃষ্টি করে এবং ইলাহী জামা'তের সহনশীলতা রূহানীয়্যতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। সেই দিক হইতে আমি দেখিতেছি যে, জামাতে আহমদীয়া এক নূতন রূহানী যুগে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং যে দুঃখ আপনারা পাইয়াছেন ইহার হেফাযত করুন এবং ইহাকে বেদনাভরা দোয়ায় রূপান্তরিত করিতে থাকুন। যদি আপনারা এরূপ করেন, তাহা হইলে আপনাদের দোয়া ও কাতরোক্তির দ্বারা আরশে-ইলাহীর পায়া সকল প্রকম্পিত হইতে থাকিবে। সুতরাং এই দুঃখের হেফাযত করুন এবং ইহাকে কখনও প্রশমিত হইতে দিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লার তকদীর স্বয়ং ইহাকে আনন্দে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। যদি আপনারা এরূপ করেন, তাহা হইলে আমি খোদাতা'লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে দুনিয়ার সকল শক্তি মিলিত হইয়াও আপনাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। পরিণামে আপনারাই সফলকাম হইবে।

(দৈনিক আল-ফযল, ৪ঠা মে, ১৯৮৪ইং)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

হুযূর (আইঃ) বর্তমান সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে নিম্নলিখিত হাদীসের দোয়াটি অধিক সংখ্যায় পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থ—হে আল্লাহ্! আমরা (ঐ অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়) তোমাকে তাদের অন্তরে (ঢালস্বরূপ) রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(আবু দাউদ : কিতাবুস্ সালাত)

একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র ও সিদ্ধান্ত

—সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

প্রিয় মুকাররম মুজিবুর রহমান সাহেব,

اسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکتہ

আপনার পক্ষ থেকে প্রেরিত বিবাহ-শাদির প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত মজলিসে শূরা ১৯৯০ এর এজেণ্ডার ১ নং প্রস্তাব সম্বন্ধে ষ্টেণ্ডিং কমিটি প্রণীত রিপোর্ট (১৭৮৮ নং ৮-৭-৯২ এর অধীনে) পেলাম। 'জাযাকুমুল্লাহ্ আহ্সানালজাযা।'

বিবাহ-শাদী উপলক্ষে আগত অতিথি দু'রকমের:

এক, যারা বহিরাগত, তারা বরযাত্রীদের সাথে সম্পর্কিত হোন, কিম্বা কনেপক্ষের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবরাই হোন—তাদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব যেহেতু আমন্ত্রণকারীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, সেহেতু তারা তাদের গৃহে অবস্থান করুন, বা না করুন, যখনই অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগমন করেন, সামর্থ্যানুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা তাদের আতিথেয়তা প্রদান আমন্ত্রণকারীর মৌলিক কর্তব্য, যা অথিতির সম্মান ও সেবা সংক্রান্ত শিক্ষার অধীনে অন্য সব অ-মুসলিমদের মোকাবেলায় (বা তুলনায়) ইসলাম ধর্মে অধিকতর গুরুত্ব রাখে।

দুই, যারা সাধারণ স্থানীয় অতিথি। এই শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের ভাগ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। এক, ঐ সব অতিথি যারা গ্রাম বা ক্ষুদ্র শহরে বাস করেন, যেখানে এমন কোনও দূরত্ব নেই। বাড়ীতে খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ও অনায়াসে দোয়ার নিয়্যতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। এরূপ অতিথিদের খানা-পিনার আয়োজনের বিড়ম্বনা ও বোঝা বহন একটা অপ্রয়োজনীয় কষ্ট স্বীকার মাত্র। সে ক্ষেত্রে অতিথির সম্মানের হক্ আদায় স্বরূপ কোন পাণীয় দ্রব্য অথবা কিছু মিষ্টান্ন পেশ করাই যথেষ্ট হ'তে পারে। এতদ্ব্যতীত, গ্রামীণ সমাজ এবং 'শরীকী ঐতিহ্য'-এর পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে যদি খাবার আয়োজন করা হয়, তবে অনেক বেশী লোক দেখানো ভাব এবং অপচয়ের আশঙ্কা থাকে। সেজন্যে যদি ঐরূপ জায়গাগুলোতে অকারণে পুনরায় মেহমানদের খাবার পরিবেশন করার প্রথাকে জারী না করা হয় তাহলে উহা শ্রেয়তর হবে। অবশ্য সামান্য ধরনের আপ্যায়নে কোন দোষ নেই।

দ্বিতীয় ধরনের স্থানীয় অথিতিরা হচ্ছেন, যারা বড় বড় শহরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন করাচী, লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি। এসব স্থানে সাধারণতঃ আহমদীদেরকে গয়ের-আহমদী আত্মীয় ও বন্ধুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতেও যেতে হয়। যদিও এই সব স্থানে খাবার পরিবেশনে দোষণীয় কিছু মনে হয় না, কিন্তু ইহা জরুরী নয় যে, খানা-পিনার দ্বারাই আপ্যায়ন করতে হবে। তবে পার্থক্যটা ভাল দেখায় না যে, গয়ের আহমদী এবং বহিরাগত অতিথিরা খাচ্ছেন এবং স্থানীয় আহমদী অতিথিরা ঠিক সে সময়ে সেখান থেকে

সরে পড়েছেন, যেন খাওয়া হারাম। সেজন্যে যথাসম্ভব একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যদি অন্যান্য অথিতিদেরকে খাবার পরিবেশন করা হয় তাহ'লে আহমদী মেহমানদেরকেও খাবার পেশ করা হোক, তবে নিয়ন্ত্রণ সংখ্যার দিক দিয়েও এবং খাবারের প্রকার বা মানের দিক দিয়েও সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত। যদি এই ছাড় দেয়াটা লোক দেখানোভাব, অপচয় এবং অমিতব্যয়িতার মাত্রায় গিয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে ইহা অসম্ভব নয় (বরং প্রয়োজন হতে পারে) যে, আবার কোন সময় জামা'ত এথেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার সাংগঠনিক ফয়সালা গ্রহণ করতে পারে। কাজেই মধ্যম পন্থাই শ্রেয়ঃ এবং ইহা নিরাপদ পন্থা।

মধ্যম পন্থাবলম্বনের শিক্ষা দেয়া উচিত। আমীরদেরকে এসব বিষয়ে উপদেশ-দাতার এবং তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। যদি গণচেতনায় (সর্বসাধারণের ধ্যান ধারণায়) মধ্যমপন্থা স্থান পায় এবং যদি তারা অযথা আড়ম্বর ও বাহুল্যকে পসন্দ না করে, তাহ'লে দু'একটা নেমন্তণে যোগদানকারীরা তাদের অপসন্দসূচক মত প্রকাশ করে দিলে ভবিষ্যতে ঐরূপ প্রবণতার প্রতি উৎসাহ ভঙ্গের উদ্দেশ্যে কোন প্রশাসনিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজনই হবে না। জামা'তকে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ কর্তব্যাদির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়ে পুণ্যকর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রবণতা অবশেষে লাভজনক সাব্যস্ত হতে পারে না। বরং বেশীর ভাগ সূত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে। যে কর্মপন্থা কুরআন করীম শিক্ষা দিয়েছে উহাই উত্তম। উহাই দীর্ঘস্থায়ী গভীর প্রভাব রাখে এবং কালক্রমেও দুর্বল হয়ে পড়ে না। বরং অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে। আর ও পন্থাটি হচ্ছে "আমর বিল মা'রূফ ও নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার' সংক্রান্ত নেযাম (ব্যবস্থা)। 'বদ রসুম' বা কুপ্রথাগুলোর বিরুদ্ধেও এর প্রয়োগ আবশ্যকীয়। নেক রেওয়াজ-রীতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যমপন্থিতাকে জামা'তের আদর্শ ও ভূমিকায় অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যেও উহাই সবচে' প্রভাবশীল কার্যকরী পন্থা।

আমাদের দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতাও ইহা প্রমাণ করে যে, কোন কোন বিষয়ে কেবল শত্রুই নয় বরং আপনজনও যদি গাম্ভীর্য ও শালীনতার সাথে ভুল-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেন, তাহ'লে ওসব বিষয়ের শখ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং মানুষ তাতে নিরুৎসাহ বোধ করে। অতএব, ইহাই উপযুক্ত পন্থা। এ অস্ত্রই জামা'তের হাতে রয়েছে। জামা'তের নেযামের উচিত, যথারীতি নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে এর প্রচলন করা। সযত্নে এর উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা।

আর একটি বিষয় দৃষ্টিগোচর থাকা দরকার। যখন আপনারা উক্ত ব্যাপারগুলোর অনুমতি দিবেন, তখন এরূপ বহু দরিদ্র ব্যক্তি থেকে যাবে, যাদের তেমন সামর্থ্য নেই। আর তাদের উপর বোঝা চাপবে। আমার বিবেচনায় এর সমাধান এই যে, বিয়ে শাদী উপলক্ষে বিত্তবান লোকদেরকে যেন উদ্বুদ্ধ করা হয় যাতে তারা নেমন্তণে ঘটা ও সীমাতিক্রম

না করেন, বরং পরিষ্কার পরিছন্ন মানানসই কিন্তু অনাড়ম্বর খাবারের আয়োজন করেন। এসব খরচের খাতে এই নিয়্যতে মিতব্যয় ও সঞ্চয় করেন, যাতে তাদের শহরে অন্য কোন গরীব অভাবী আহমদী কন্যার শোভনীয় বিদায় অনুষ্ঠানে দারিদ্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করতে পারে। কাজেই স্থায়ীভাবে এরূপ এক ফাণ্ড জারী করা উচিত, যেখানে বিয়ে-শাদী উপলক্ষে কেবল আল্লাহ্‌র তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, শুধু উভয় পরিবারই নয়, বরং জামাতের সকল বিত্তবান বন্ধুর মধ্যে স্থায়ী এক তাহরীক জারী করা হোক, তারা যেন গরীব মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য অবশ্যই নিজেদের ধন-সম্পদ হ'তে কিছু দান করেন, যাতে কন্যা বিদায় কালে মেহমানদের সামান্য আপ্যায়নেরও যাদের সামর্থ্য না থাকে, তাদেরকে উক্ত ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেয়া যায়, এবং একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবে গরীবানা মাপকাঠিতে তাদের বিভিন্ন রকম খরচের ভার বহন করা যায়। এটা এরূপ এক ব্যাপার যেখানে জামাতের বিত্তশালী বন্ধুরা আনন্দচিত্তে মুক্ত হস্তে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। বরং এই রেওয়াজ-রীতির প্রচলন ঘটানোও দরকার, যাতে সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা কোনও না কোন গরীব কন্যাকে বিয়ে দেওয়ানোর জন্যে নিজেদেরকে পেশ করেন। এরূপ কাজ জামাতের মাধ্যমে করা জরুরী নয়। তারা সরাসরিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যদি সমীচীন মনে করেন তাহ'লে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পরস্পর এরূপ সম্পর্কও গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে ক'রে গরীব ঘরের মেয়েরা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে যায়।

আমার স্ত্রী মৃত্যুর পূর্বদিনগুলোতে তাঁর এই আকাঙ্খার কথা বলেছিলেন যে চারটি (গরীব-ঘরের) মেয়ের তিনি নিজে বিয়ে করাতে চান সুতরাং আমি খোদাতা'লার ফযলে তার চেয়েও অধিক সংখ্যক ওরূপ মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। এবং প্রতিবারই তা করাতে আমার রূহানী স্বাদ উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি কেবল এজন্যেই ইহা বর্ণনা করছি যাতে জামা'তে এই রীতি প্রচলিত হয়ে যায়। আর একটি প্রশ্ন উঠতো যে, ধনীরা যদি কন্যা বিদায় অনুষ্ঠানে অধিক খরচ করেন তাহ'লে গরীবদের অন্তর জ্বলবে। উক্ত উপায়সমূহ অবলম্বনে ঐ আপত্তিরও অবসান ঘটবে। কিন্তু এটাও প্রকৃতপক্ষে আহ্‌মদী গরীবদের উপরে একটা এলযাম (দোষারোপ) বৈ অন্য কিছু না। আমি তো আহ্‌মদী গরীবদেরকে বড়ই উচ্চ সাহস ও প্রশস্ত অন্তঃকরণের অধিকারী বলে মনে করি। তাঁদের উপর কুরআন করীমের নিম্নরূপ শিক্ষা প্রযোজ্য ও সত্য সাব্যস্ত হয়ঃ

لاتمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم (سورة الحجر : ٨٩)

(অর্থাৎ, অন্যের সম্পদের দিক লোলুপ দৃষ্টি দিও না)।

কাজেই তাদেরকে অহেতুক লোভী অথবা হিংসুক মনে ক'রে নিজের পক্ষ থেকে এরূপে তাদের মনোরঞ্জন করা যে, ধনীরাও অতিথিপরায়ণতা থেকে সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে নেন, এটা এর যথার্থ প্রতিকার নয়। এমনটি করায় বিশেষ কোন ফায়দাও পরিলক্ষিত

হয় না। কেননা অভিজ্ঞতা বলে দিয়েছে যে, এতে বিশেষ কোন ফায়দা হয়ও নি। যে যুগে এই রেওয়াজ ছিল যে, গরীবরাও মেহমানদের যখন কিছু না কিছু আপ্যায়ন করতেন তখন ঐ সকল ধনী ব্যক্তি যারা তাতে যোগদান করতেন তারা তাতে প্রভাবান্বিত হয়ে গোপন হাতে নিশ্চিৎ কিছু না কিছু সাহায্য করতেন। এখন তো ধনী আর দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে। কাজেই পুণ্য কাজের প্রচলনের জন্যে পুণ্যের 'রূহ্' বা মূল-তত্ত্বকে উপলব্ধি করা আবশ্যকীয় যে, ধনীরা যেন গরীবদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাদেরকেও সে সুযোগে উপহারাদি পেশ করেন এবং তাদের সাথে বসে তাদের গরীবানা ভোজে শরীক হন। তেমনি গরীবদেরকে ধনীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যেন অবশ্যই আমন্ত্রণ করা হয়। তাদের দারিদ্রকে যেন লজ্জা না করা হয়। বরং আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নিঃসংকোচে বিত্তশালী বেশ-ভূষায় আবৃত অতিথিদের মধ্যে গরীবদের যোগদান প্রকৃতপক্ষে তাদের পক্ষে একটা কোরবানীই বটে। সেদিক থেকে তাদের আগমনকে যেন সম্মানজনক জ্ঞান করা হয় এবং গয়ের আহমদী অতিথিদের কাছে এ কথা যেন সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সরলতা এবং গরীবদের সম্মান প্রতিষ্ঠা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে ইহাও জরুরী যে, গরীবদের সম্মিলিত ভোজের সময় যেন তরবীয়ত করা হয়, যাতে কেউ তাদের দরিদ্রজনিত অপারগতার জন্যে হাসতে না পারে। আমার স্মরণ আছে, বহুবার আমি রাবওয়াতে নিমন্ত্রণে যেগেদান করেছি, যেখানে বিশেষভাবে গরীব বাচ্চারা খাবারের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের এই কাণ্ড দেখে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল লোকেরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং এরূপ কোন কোন কটাক্ষ করলেন, যা থেকে অহঙ্কারের গন্ধ আসছিল। যখনই আমার সামনে ওরূপ ঘটনা ঘটেছে তাদেরকে আমি বুঝিয়েছি যে, খোদাকে ভয় কর। তোমাদের সেই অনুভূতিই নেই যাতে তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পার যে, বকরা ঈদেই কেবল যাদের ভাগ্যে গোশ্ত খাওয়া জুটে, অথবা ঘরে কখনও যাদের পোলাও জর্দা দেখার সৌভাগ্য হয় না তারা ভাগ্যক্রমে যখন এরূপ নিমন্ত্রণের সুযোগ পায় তখন তাদের সংযম হারিয়ে ফেলা, তাদের চাইতেও শহরের বিত্তশালী লোকদের অনুভূতিহীনতার চিত্রই পেশ করে। তথাপি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী যেখানে ধনীদের বুঝানো দরকার, সেখানে গরীবদেরকে বুঝানোও তো আবশ্যকীয়। তাদের তরবীয়তের জন্যে সিলসিলার কর্মীবৃন্দ নিযুক্ত করা উচিত। তাঁরা তাদেরকে প্রেম-প্রীতির সাথে বুঝাবেন, যাতে এসব উপলক্ষ্যে তাদের আচরণ অবিকল ইসলামের শিক্ষার প্রতীক হয়।

অসুন্দর ও দোষণীয় ব্যাপারগুলোর সাথে যদ্দূর সম্পর্ক, গ্রামগুলোতে সেগুলো পথ করে নিচ্ছে সেখানকার অবস্থানুযায়ী এবং শহরগুলোতে সেখানকার অবস্থানুযায়ী। কিন্তু এ দোষগুলোর প্রত্যেকটির মূলোৎপাটনের চেষ্টা করা উচিত কেবল আনুষ্ঠানিক ও ভাসা-

ভাসাভাবে নয়, বরং উহার প্রকৃত স্বরূপ ও বাস্তব অবস্থার গভীরে পৌঁছে, যাতে বারণ-কারীরা অবগত হয়, ঐ অসুন্দর ও দোষণীয় ব্যাপারটা কী। যেমন, মেহেন্দী-অনুষ্ঠান প্রথা। মূলতঃ এর মধ্যে এটা দোষণীয় নয় যে, এ উপলক্ষে কনের বান্ধবীরা একত্রিত হয়ে আনন্দ করুক। যদি এটাকে আনন্দ প্রকাশের স্বাভাবিকতার পর্যায়ে (সীমিত) রাখা হয় তাহলে এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু এটাকে যদি প্রথা হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে, বাহির থেকে বরপক্ষকে অবশ্য মেহেন্দীর ডালা নিয়ে শোভা যাত্রা করে পৌঁছুতে হবে, তাহ'লে স্পষ্টতঃ এতে নিশ্চিৎ বানোয়াট ও কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কনের মেহেন্দী (কনের) ঘরেই তৈরী হওয়া উচিত। এর জন্যে ক্ষুদ্রাকারে একটা বর যাত্রার প্রথা বিভিন্ন রকম দোষের উদ্ভব ঘটাবে। এই উপলক্ষে বরপক্ষ থেকে রীতিমত দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হওয়া এবং এ উপলক্ষে আনুসঙ্গিক ব্যাপারাদি, আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ ইত্যাদি—এ সবই যখন প্রথার রূপ ধারণ করে তখন সোসাইটির উপর ভার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم (এবং সে তাদের বোঝা এবং তাদের গলার বেড়ি যা তাদের উপর চেপেছিল তা তাদের উপর হ'তে অপসারিত করে) এর মূলতত্ত্বের পরিপন্থী সাব্যস্ত হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আবারও সরলতার দিকে ফিরা আবশ্যকীয়। কিন্তু শুভ চেতনা অর্থাৎ "আমর বিল মা'রুফ" এবং "নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার"—কুরআনী নির্দেশের অন্তর্নিহিত চেতনার প্রতিই যেন বিশেষ লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে এবং কমিটির পেশকৃত প্রস্তাবের ৭ নং ধারায় যেমন সুপারিশ করা হয়েছে, তদনুসারেও এ ক্ষেত্রে কঠোর নীতি বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপের চিন্তা-ভাবনা না থাকে, বরং থাকে কেবল তরবীয়তি উদ্যোগ। তবে তা হতে হবে বারংবার। উপদেশ যদি এক বার ক্রিয়া না করে, তাহ'লে আবারও করা হোক। তারপর পুনরায় করা হোক। এমন কি, "যাক্কির" (বার বার স্মরণ করাও) সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর প্রচলন ঘটে এবং "ইন নাফায়াতিয্‌ যিকরা" (—নিশ্চয় এরূপ উপদেশ সার্থক হবে)—সংক্রান্ত ফলোদয় ঘটতে আরম্ভ করে।

যে সব কদর্য ক্রিয়াকলাপ পথ ধরেছে সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে সাধারণভাবে বেপর্দা হবার প্রবণতা —যা নিশ্চয় শরীয়তের সীমাসমূহ ডিঙ্গিয়ে যাবার কাছাকাছি হয়ে পড়েছে এবং বিয়ে-বাড়ীর (অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত) লোকদের এ ব্যাপারে অচেতন-তাকেও চিহ্নিত করে থাকে। কেননা সম্ভ্রান্ত অতিথিদের মধ্যে বহু সংখ্যক লজ্জাপরায়ণ পর্দানশীন মহিলারা থাকেন। কোথাকার ফটোগ্রাফারদের অথবা দায়িত্বহীন ও অপরিচিত (গয়র-মাহরাম) পুরুষদের নিঃসংকোচে ডেকে নিয়ে ছবি তোলানো এবং এ ব্যাপারটা যে কেবল পরিবারের নিকট-আত্মীয়দের গণ্ডী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ সে দিকে কোনও পরোয়া বা ভ্রূক্ষেপ না করা—এব্যাপারে স্পষ্টাক্ষরে বার বার উপদেশ দান করা উচিত যে, অন্দর মহলে (মহিলাদের দিকটাতে) তাদের যদি কোন ভিডিও ইত্যাদি করতেই হয়, তাহলে

অতিথিদেরকে যেন সতর্ক করে দেয়া হয় এবং কেবল পারিবারিক সীমিত গণ্ডীতেই যেন শখ পূরো করা হয়।

বেহুদা গানের প্রবণতাও এসব কদর্য কার্যকলাপের অন্যতম। বেহুদা গানের মধ্যে অশ্লীল গীত (যেমন পাঞ্জাবী ভাষার প্রচলিত "সেঠনিয়াঁ দেনী" ওগুলোরই শামিল), যা ঠাট্টা-মস্কারির চেয়েও ঢের বেশী অশ্লীলতা ও গালিগালাজ এবং খোলাখুলিভাবে অবমাননার পর্যায়ে উপনীত। ঐরূপ গানের পরিবর্তে হযরতে আকদাস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর নযমগুলো প্রচলিত করা উচিত। তেমনি সাফ-সুতরা কাব্য মালার দিকে রুচি-জ্ঞান ও অনুরাগের সৃষ্টি করা উচিত। জামা'তের মাঝে, প্রকৃতপক্ষে লাজনার মধ্যে এ বিষয়ের উপরও এক বিশেষ চিন্তা-ভাবনার ফোরাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, যাতে আনন্দ প্রকাশের এমন ধরনের পন্থাবলীও চিন্তা করে ঠিক করা হয় যা সাফ-সুতরা, নিখিল নিখাদ ও পবিত্র হয় এবং শোক-সমাবেশ ও বিয়ের আসরের মাঝে ফারাক স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। কেবল পথ-ঘাট বন্ধ করাই তো যথেষ্ট নয়। সুষ্ঠু সুস্থ উৎকৃষ্টতর পন্থাবলী নিরূপণ করাও আবশ্যকীয়,—যেগুলোর দরুন মন-মানসিকতার উপর সুপ্রভাব পড়ে, সুগভীর রেখাপাতে মাহ্‌ফিলসমূহ স্মরণীয় হয়ে থাকে, কিন্তু তা হতে হবে পাপ-পঙ্কিলতার দিকে আদৌ না ঝুঁকে, যাতে অস্বস্তির পরিবর্তে প্রফুল্লতার সৃষ্টি হয়। এবং দর্শকরাও পুণ্য প্রভাব (নিষ্কলুষ সুপ্রভাব) নিয়ে ফিরে যেতে পারেন। তবে জামা'ত যেন অভিনয় ও অনুকরণকারী না হয়, বরং জামা'তকেই যেন অন্যেরা অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। আমার এসব নির্দেশনাবলীর সম্পর্ক হচ্ছে প্রস্তাবের ১ থেকে ১১নং ধারাসমূহের সাথে।

কুপ্রথাসমূহের সাথে যদ্দুর সম্পর্ক সে-ক্ষেত্রে প্রথমে তো পর্যাপ্তরূপে সেগুলোর চিহ্নিত করণ, সেগুলোর অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং বুঝানোর একান্ত প্রয়োজন, কেন যে এ গুলো কুপ্রথা। যাতে জামা'তের উপর ব্যাপকভাবে অকাট্য যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয়। আর যাতে পরবর্তীতে কয়েক মাসের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর আবার এই মর্মে সতর্কীকরণও সম্পন্ন হয় যে, কোন আহমদী পরিবার যদি কুপ্রথাগুলোর সাথে জড়িয়ে থাকার উপর হঠকারিতা দেখায়, তাহলে মানসিকভাবে তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত যে, প্রতিবাদ স্বরূপ কমপক্ষে হলেও জামা'তের দায়িত্বশীল বন্ধুরা এবং ওহ্‌দাদার প্রমুখগণ অনুমতি নিয়ে সে-অনুষ্ঠান হতে উঠে যান। উদ্দেশ্য এ নয় যে, সেখানে কোন হাঙ্গামা সৃষ্টি করে পৃথক হন, বরং আন্তরিকভাবে অপারগতা জ্ঞাপন করে, আলগভাবে নিজেদের অপারগতার কথা পেশ করে অনুমতি নেয়া শুরু করে দেন। তবে এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে জানানো আবশ্যকীয় যে, যদি তাঁরা দায়িত্বশীল না হন তাহলে অবশ্যই এমনটি হবে।

গরীবদের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে এখানে আমি যে কয়েকটি সমাধান বা প্রস্তাবনা করেছি সে-গুলো যে হুবহু প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবর্তনযোগ বা কার্যকর হতে হবে তা জরুরী নয়। এগুলো

হচ্ছে এতদ সম্পর্কিত কয়েকটি অবস্থা উপযোগী রূপ মাত্র, যা দৃষ্টিগোচরে রেখে অনেকাংশে সেগুলো কার্যকর বা আমল করা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ বিবেচনাসাপেক্ষ যে, সব গরীবই ধনীদের বিয়ে-শাদীতে রুখ্‌সতির (কন্যা বিদায়) বেলায় আপ্যায়নে হীনমন্যতায় (Inferiority Complex-এ) ভোগেন এবং মনঃকষ্ট বোধ করেন। প্রথমতঃ ওখানে কী হয়ে থাকে। যদি তারা রুখসতি উপলক্ষ্যে হীনমন্যতার শিকার হন তাহলে নিত্যনৈমিত্তিক থাকা-খাওয়া-পরার ক্ষেত্রেও তো সে একই অবস্থা প্রযোজ্য হয়। কেবল বিয়ে-শাদীরই নয়, শোক-দুঃখের এবং রোগ-ব্যাধির অবস্থাগুলোও তো এসে যায়। তারপর ওলিমা-অনুষ্ঠান রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যে কষ্ট ও সংকট এসে দাঁড়ায় ওগুলোর তো সমাধান হওয়া উচিত। গরীবরা কেবল কন্যাপক্ষই নন বরং ছেলেপক্ষও হয়ে থাকেন। এতো ব্যাপক এক সমস্যার এটুকু সংক্ষিপ্ত সমাধান সাব্যস্তকরণ কখনও যথেষ্ট নয়।

রুখ্‌সতি উপলক্ষ্যে আপ্যায়ন করার কিছু কিছু উপকারও তো ছিল? সেগুলো হতে গরীবরা বঞ্চিত থেকে গেল। আমার স্মরণ আছে, কাদিয়ানে রুখসতি অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় গরীবদেরও আমন্ত্রণ করা হতো এবং তাদের জন্যে বহুবার সুযোগ ঘটতো যাতে তাঁরাও বহুবার (অপেক্ষাকৃত) উৎকৃষ্ট খাবার খেতে পারেন, অথবা ভাল চা-ক্র ইত্যাদিতে শামিল হতে পারেন। বার বার অপেক্ষাকৃত বিত্তবান লোকদের বিয়ে-শাদীতে যোগদান করে তাদের সাথে একত্রে তাদের বসার সুযোগ লাভ হতো। বস্তুতঃ আমরা যখন 'বিত্তবান' বা 'ধনী' শব্দ বলে থাকি এর দ্বারা কখনও 'বিরাট ধনী' বুঝায় না। ইহা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আহ্‌মদীও যখন রুখসতি অনুষ্ঠান করতেন তখন চায়ের দ্বারা আপ্যায়নের আয়োজন পেশ করতেন। সেগুলোতে গরীবরাও আগ্রহের সাথে যোগদান করতেন। এহেন সুযোগগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন। এটাও তো সোসাইটির একটা ক্ষতি বৈ কি?

এ দৃষ্টিভঙ্গীও সঠিক নয় যে, গরীবের বিয়েতে তাদের উপর অসাধারণ ব্যয়ভার চাপে। আপ্যায়ন হর-হামেশা এক আপেক্ষিক ব্যাপার হয়ে থাকে। কাদিয়ানেই আমার মনে আছে কতিপয় গরীব শুধুমাত্র এক পেয়ালা চা এবং এর সাথে সামান্য মিষ্টি বা পাকোড়া (বড়া জাতীয় খাদ্য) ইত্যাদি পরিবেশন করতেন এবং ধনী যারা এসব বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন, এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা গরীব ভাইদের প্রয়োজন ও অভাব-অনটন সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন ও সংবেদনশীল হতেন। গোপন হাতে তাদের সাহায্য করতেন। কাজেই জামাতগুলোতে গরীবদের বিয়ে-শাদীতে আড়ম্বরপূর্ণ খরচাদি করার আয়োজন করাও অপরিহার্য নয়। প্রত্যেক গরীব খোলাখুলিভাবে সাহায্যও গ্রহণ করেন না। গরীবদের মধ্যেও বহু সংখ্যক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক আছেন, যারা বিবাহ-অনুষ্ঠানে কোন কিছু পরিবেশন না করেও (অপারগতার জন্যে) হীনমন্যতাবোধের শিকার হন না।

তাঁরা সসম্মানে মান মর্যাদা বজায় রেখে উন্নতশিরে কন্যাকে বিদায় দেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মৌলিক উচ্চ মানবীয় মূল্যবোধ, যার বিকাশ ও বিস্তার প্রয়োজনীয়। জরুরী নয় যে, ধনীদের কাছে সরলতা দেখেই সরলতার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। যে সরলতার আদর্শ হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুন্নত (দৃষ্টান্ত) থেকে গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়, সে সরলতার মধ্যে রয়েছে অমুখাপেক্ষিতা। রয়েছে আত্মতুষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ। এর এক অত্যন্ত পবিত্র দৃষ্টান্ত, আমার জানা মতে মৌলবী মুহাম্মদ মুনাওয়ার সাহেবের রচিত সেই প্রবন্ধ পাঠে সামনে এসেছে, যা তিনি তার পরলোকগত স্ত্রীর স্মরণে লিখেছেন। কী (অদ্ভুত সরল) ভাবে তাঁর দু'টি বিবাহ হলো! অত্যন্ত সরলতা সত্ত্বেও তাদের আত্মমর্যাদায় এতটুকুও ময়লা লাগে নি। বরং গোটাজীবন পূর্ণ মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই ধনীদের বিবাহ-অনুষ্ঠান দেখে গরীবদের মন জ্বলতে থাকবে এবং তাদের জীবন উচ্ছন্ন হয়ে পড়বে—এরূপ ধ্যান-ধারণা সঠিক নয়। হ্যাঁ, তবে ইহা মন-মগজে লুকানো কম্যুনিজমের জীবানু থেকে সৃষ্টি হয়। আমাদেরকে তো সুদীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের দ্বারা জামাত'কে প্রকৃত ও যথার্থ আত্ম-মর্যাদাবোধ ও গাম্ভীর্যে ভূষিত করতে হবে। কাজেই বিয়ে-শাদী প্রসঙ্গে যদি গরীব ভাইদের সাহায্য করতে হয়, তাহলে একটা আনুষ্ঠানিক রেওয়াজ বা প্রথার আকারে ইহা বিস্তার দেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু অনুভূতি ও চেতনাকে সঞ্জীবিত রাখা এবং ধনী ও বিত্তশালী লোকদের মধ্যে অবিরাম উপদেশ দানের মাধ্যমে এই প্রবণতাকে শক্তিশালী করা, যাতে আল্লাহ্‌তা'লা যে-সব নেয়ামত, সুখ-সম্পদ তাদেরকে দান করেছেন, সে-গুলোর প্রত্যেকটি থেকে কিছু না কিছু অংশ নিজেদের গরীব ভাইদেরকে এমনভাবে পেশ করেন, যেন এর ফলে তাদের মাথা নত না হয় বরং আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসায় ভরে যায়। কুরআন করীম আল্লাহ্‌তা'লার পথে ব্যয় করার যে-সব পদ্ধতি শিখিয়েছে সেগুলোর প্রসঙ্গে এ উপদেশও রয়েছে যে, "ঐ বস্তু পেশ করো না, যা তোমাদেরকে অন্য কেউ দিলে লজ্জায় তোমাদের মাথা নত হয়ে যায়।" এ উপদেশটিতে যদিও বাহ্যিকভাবে বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু আমার মতে এর বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক এবং কোন জিনিস পেশ করার পদ্ধতি ও ভঙ্গীও এর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন লোক ভাল জিনিসও এমনভাবে পেশ করেন যে, গ্রহীতা মনে মনে ভীষণ লজ্জা বোধ করে। আবার কোন কোন লোক সামান্য জিনিসও এমনভাবে পেশ করেন যে, কোন অপমান বোধ করার পরিবর্তে বরং দাতার জন্যে গ্রহীতার অন্তরে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে। কুরআন করীম যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে তাতে পেশকৃত বস্তুর আনুসঙ্গিক ব্যাপারাদি এবং পারিপার্শ্বিকতাও শামিল।

অতএব, কুরআনী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআনী চারিত্রিক মূল্যবোধগুলোকেও সঞ্জীবিত করাই আমাদের কর্তব্য। গরীবদেরকে ইহা বুঝাবার প্রয়োজন যে, তাদের সামর্থ্যে

যতটুকু কুলায় ততটুকুই আপ্যায়ন যেন পেশ করেন এবং তাতে কখনও লজ্জা না করেন। আর ধনীদের বুঝাবার দরকার এই যে, রিয়াকারী এবং শয়তানের রঙে আড়ম্বরপূর্ণ খরচাদি থেকে যেন বিরত থাকেন, নিজেদের অনুষ্ঠানাদিতে মিতব্যয়িতা, মধ্যমপন্থা এবং গাম্ভীর্য অবলম্বন করেন এবং "মিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউনফেকূন"-এর নির্দেশ অনুসারে সব রকমের খুশীতে নিজেদের দুর্বল ভাইদের অংশ যেন সংরক্ষিত রাখেন। তবে যথাসম্ভব গোপন হতে এবং অন্যের আত্মসম্মানবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে যেন তা করা হয়।

অবশেষে একটি প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখে পর্যালোচনাটি শেষ করছি। প্রশ্নটা হচ্ছে, গরীবদের সংখ্যা বেশী এবং ধনীদের কম—এমতাবস্থায় গুটি কয়েক ধনী সকল গরীবের বোঝা কি করে বহন করতে পারে?

প্রথমতঃ বিত্তশীলতা এবং দারিদ্রের ভাগ-বিভাগ বা বিভক্তিকরণ এভাবে সমান নয় যে প্রত্যেক শহরে গ্রাম-গঞ্জ বা অঞ্চলে কয়েকজন বেশী ধনী এবং কয়েকজন বেশী গরীব থাকে। এসব হচ্ছে আপেক্ষিক বিষয়। কোন কোন জিলা, শহর বা অঞ্চল গরীব। সাধারণতঃ যাকে ধনী বলা হয় বা বুঝায় সেইরূপ ধনী সেখানে নেই। অথবা পার্থক্য থাকলেও তা সামান্য সামান্য। সেখানে ঐ শিক্ষা বা নীতিই যথার্থ ও শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা। সমগ্র সোসাইটির মাঝে এই মন-মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার—সঙ্গতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনাদি মিটানো। কার্যতঃ তাই হয়ে থাকে। যেমন, ডেরাগাজীখান জিলার জামাতসমূহের ক্ষেত্রে কন্যা-বিদায় অনুষ্ঠান কালে কয়েকটি ক'রে খেজুর পেশ করা একটি উৎকৃষ্ট আপ্যায়ন। অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরা বেশী লোকদের ডাকেন এবং অপেক্ষাকৃত গরীবরা কম লোককে। কিন্তু সামর্থ্যানুযায়ী সাধারণ রকমের আদর-আপ্যায়ন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করে থাকেন। কিন্তু শহরাঞ্চলে ধনী-গরীবের অপেক্ষিক মাত্রা ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু যারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং মন-মানসিকতার দিক দিয়ে সাহায্য গ্রহণের দিকে যাদের প্রবণতাও আছে—সেসব গরীবের সংখ্যা খুব একটা এমন বেশী নয় যে, তাদের শামাল দেয়া যাবে না। কিন্তু যদি নাও যায় তবুও সর্বশেষ ও অনিবার্য উপায় বা ব্যবস্থা তো উহাই যা আমাদেরকে নীতিগতভাবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ দারিদ্রকে আদৌ লাঞ্ছনার কারণ স্বরূপ ধরা যাবে না এবং চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও নেকীকে সম্মানের কারণ বলে-এর অনুভূতিকে মন-মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহল্লাবাসীদের কাজ হবে তারা যেন গরীবদেরকে বুঝান, 'তোমরা যদি কোন কিছু পরিবেশন না-ও কর, আমরা তোমাদের বিয়ে-শাদিতে শামিল হব এবং সসম্মানে মেয়েকে তুলে দিব।' তারপর তাদের সামর্থ্যে কুলোলে তারা কিছু খরচপাতি করলেও করতে পারেন। নচেৎ তাদের অংশগ্রহণই গরীবদের সম্মানের কারণ হতে পারে। এমনটিও হতে পারে যে, যেখানে সম্ভব হয় লাজনার

সাহায্যে কয়েকজন মহিলা বিয়ের বাড়ীগুলোতে পূর্বাহ্নে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে দিবেন এবং সাদাসিদেভাবে কিছু পাকোড়া বা নকুলদানা জাতীয় সামান্য ব্যয় সাপেক্ষে মিষ্টি তৈরী করা যেতে পারে। এটা এমন কোন বোঝা নয় যা গ্রামীন ও শহুরে জামাতসমূহ বইতে না পারেন। কিন্তু যে জিনিসটার অভাব আমি অনুভব করছি তা হচ্ছে, ধনীরা গরীবদের অবস্থা সম্বন্ধে সেরূপ খোঁজ-খবর রাখেন না যেরূপ কাদিয়ানে রাখতেন। জামাতী নেযামের উচিত, ধনীদেরকে স্মরণ করাতে থাকা এবং আশে-পাশে যেখানে কোন বিবাহ হচ্ছে দেখা যায়, সেখানে যেন চেষ্টা করেন যাতে বিবেকবান পরিবার-গুলোর ছেলে-মেয়েরা এতে অবশ্যই যোগদান করে। কিছু দিক বা না দিক, সেজন্যে কোন কথা নেই। তাদের যোগদানই হবে গরীবদের মনোরঞ্জনের কারণ এবং তাদের নিজেদের আত্মশুদ্ধির উপকরণ।

তেমনি কেবল কন্যা রুখসোতির বেলাতেই নয়, (বরং) ওলীমাগুলোর (বৌ-ভাত) বেলাতেও এ যাবতীয় কার্যক্রমই আবশ্যকীয়। কন্যাবিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন বন্ধ করিয়ে কী ক'রে চিন্তা করা যায় যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। ওলীমা তো ফরয। সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। যেমন ওলীমার কর্তব্য কাজ কয়েকজন ব্যক্তিকে খাবার পেশ করার মাধ্যমে সমাধা হতে পারে, তেমনি রুখসোতির বেলায় কেন হতে পারে না? তাছাড়াও, ওলীমাতে রুখসোতি অপেক্ষা অধিক খরচের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকে। সেজন্যে ওলীমার বেলায় উল্লিখিত বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যকীয়। মোদ্দা কথা, জামাতের দৃষ্টি যদি এসব বিষয়ের দিকে সদা নিবদ্ধ থাকে এবং তাকওয়ার সাথে জামাত এ সব ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাহ'লে পবিত্র সামাজিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সকল সাংসারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কাজেই আপ্যায়নের পেছনে পড়ার পরিবর্তে অযথা রেওয়াজ-রীতি ও প্রথা, এবং লোক দেখানোভাব ও অপচয়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মোকাররম মৌলবী মুহাম্মদ মুনাওয়ার সাহেব রচিত "এক নেক বিবি কী ইয়াদ ম্যা" একটা ভাল পুস্তক। ইহা বিয়ে-শাদীর উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে বিস্তার দেয়া উচিত। পুস্তিকাটি ধনীদেরও পড়ানো উচিত এবং গরীবদেরও, যাতে তারা জানতে পারেন যে, বিয়ে-শাদী এই পদ্ধতিতেও সুসম্পন্ন হয়। এতদ্বারা তাদের মনস্তাত্ত্বিক বা আত্মিক সংশোধন হবে এবং বহু ধরনের রেওয়াজ-রীতি ও প্রথার অপনোদনের দিকে সচেতনতার সৃষ্টি হবে। সত্যিকার আত্মসম্মানবোধ এবং গাম্ভীর্য বোধ জাগরিত হবে।

... ...

মোকাররম চৌধুরী মোবারক আহমদ সাহেবের (ব্যারিষ্টার) ভিন্নমত সম্বলিত নোটের পর্যালোচনার যেটুকুন সম্পর্ক সে ক্ষেত্রে তাঁর এ যুক্তিটি গ্রহণ যোগ্য নয় যে, ...

'এর বাধ্যবাধকতার মৌলিক উদ্দেশ্য গরীবদেরকে সাধ্যাতীত কষ্টের বোঝা হ'তে বাঁচানো।' এর কোন ভিত্তি নেই, কেবল আলোচ্য বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ মাত্র। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা প্রমাণিত না হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যামানায় যথারীতি রুখসোতি উপলক্ষে অনুষ্ঠান উদযাপিত হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা বলা যে, কোনও রকম খাবার পরিবেশন করা যাবে না—ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অযথা বক্তব্য বলে প্রতীয়মান হয়। মেহমানদের সম্মান দেখানো ও কিছুটা আদর-আপ্যায়নকে শরীয়তের বরখেলাপ বলে আখ্যা দেয়া সঠিক নয়। চৌধুরী মোবারক আহমদ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ফলোদয়ের কারণ হবে, যা তিনি প্রায় অনুধাবন করা সত্ত্বেও উপেক্ষা করেছেন। এ যুক্তি কেবল এ (সীমা) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যমানায় যদি কোন সময় কনের পিতা নিজেই কনেকে ছেড়ে আসতেন এবং নেমন্তন্নে লোকদের ডাকার কোন 'আমল' প্রমাণিত বলে কোন কিছু না থাকে, তাহ'লে তো (মুলতঃ) রুখসোতি অনুষ্ঠানই না-জায়েয সাব্যস্ত হয় এবং এর উপর পাবন্দি বা বাধানিষেধ আরোপিত হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ইহাকে এ বলে উপেক্ষা করা যে, ইহা বর্তমান অবস্থাবলীর চাহিদা সম্মত। তারপর আবার এই দলিল পেশ করা যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর যুগে এ ধরনের অনুষ্ঠান বা খাবার ইত্যাদি পরিবেশন করা হতো না—এটা এমনই কথা, যার ভিত প্রথমে পায়ের নীচ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর ফল বা সিদ্ধান্ত দেখানো হচ্ছে।

কাজেই আবারও প্রমাণ করে দিতে চাই যে, যদি এ বিষয়ের অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যামানায় ওরূপ অনুষ্ঠানই হয়ে থাকতো যেরূপ এখন মুসলিম জাহানে প্রচলিত আছে (আবার কোন কোন জাতির মাঝে এর প্রচলন নেই) তা সত্ত্বেও মেহমানদেরকে কিছু আপ্যায়ন পেশ করা অপসন্দনীয় (মকরূহ্) বা নিষিদ্ধ (মমনু') বলে মনে করা হতো, তাহ'লে তো এর অনুমতি দেয়া জামা'তের নেযামের এখতিয়ার বহির্ভূত। একটি সুদৃঢ় শরীয়তগত বাধা আমাদের সামনে এসে যাবে। আমার জানামতে ওরূপ কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং রেওয়াজ-রীতিই (প্রচলন) ভিন্নতর ছিল। কাজেই এ বিষয়কে যদি বিবেচ্য-বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয় যে, ঐ যুগে যেহেতু কোনও রকম রুখসোতির অনুষ্ঠানের প্রচলনই ছিল না, সেহেতু এটাকে শরীয়ত অননুমোদিত বলে নির্ধারণ করা হয়, তাহ'লে ব্যাপারটি এখানেই থেমে যাবে না, বরং হুজ্জতুল্লাহ্ হযরতে আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর সাহাবাদের দৃষ্টান্ত ও অবস্থানকেও নাউযুবিল্লাহ শরীয়ত-বিরোধ বলে সাব্যস্ত করতে হবে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের বিষয়াদির উপর গভীর ও সম্যক দৃষ্টি না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা কারণে শরীয়ত-গত দলিল-প্রমাণ তালাশ করা এবং এ বিষয়ে চিন্তা না করা যে, এর কী রকম মারাত্মক ফলাফল দাঁড়াতে পারে—এ কোনও নিরাপদ ও ত্রুটিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নয়। আঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের যুগে তো গরীবরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অতিথিসেবা করতেন এবং হীনমন্যতার অনুভূতি তাদের মধ্যে ছিল না। এটা কে-ইবা বলেছে যে, দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনীদের সাথে পাল্লা দিয়ে ও সমতা রক্ষা ক'রে ওরূপেই মেহ্‌মানদারী করতে হবে। গরীবদের হাজারো বিয়ে-শাদি হয়ে থাকে যে সম্পর্কে ধনীদের কানে খাতাসও যায় না যে, সেগুলোতে কি হচ্ছে এবং এই লোকগুলো কী সব সঙ্কটাবলীর মধ্যে নিপতিত। কাজেই হয়ত রুখসোতি অনুষ্ঠানের প্রচলনকেই সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়া হোক, নয়ত অতিথির সেবা ও সম্মান প্রদর্শন—যা শরীয়তগতভাবে মৌলিক ও স্থায়ী মূল্য ও মর্যাদা রাখে, ইহাকে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় লৌকিকতা, আড়ম্বর ও লোক দেখানো মনোভাব থেকে বিমুক্ত রাখা অবশ্য আমাদের কর্তব্য, বিলোপ সাধন আমাদের কাজ নয়। অন্যথায় কেন এরূপ চিন্তা করেন না যে, ধনীরা তাদের কন্যাদের সে রকম দু'টো জোড়া দিক এবং অতি সাধারণ জেহেষ (যৌতুক) দিক যেমনটি গরীবরা দিয়ে থাকে। ওরূপ চিন্তা বা দৃষ্টিকোণ থেকে তো আবার যুক্তির পরিধি প্রসারিত হতে থাকবে। ইসলাম কেবল বিনয় ও অমায়িকতার শিক্ষা দেয় না বরং আত্ম-তুষ্টি, সংযম ও ধৈর্যেরও শিক্ষা দেয়। মোট কথা এ রকমের ধ্যান-ধারণাও জামাতের মধ্যে বিদ্যমান। সেগুলো শ্রবণ করা এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের কর্তব্য। সাথে তাদের ভুল বুঝাবুঝিগুলোকে চিহ্নিত করাও আবশ্যকীয়।

মোট কথা, সুগভীর চিন্তা-ভাবনার পর কমিটি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। অবিকল এটাই আমার অভিপ্রায় ছিল যা আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। কমিটির গোটা সুপারিশমালাই অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এগুলোর মধ্যে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়াবলী তো উপেক্ষিত হচ্ছে, মানুষ কেবল খাবারটাই দেখছে। কমিটির সুপারিশমালাকে আমার এই পর্যালোচনার অধীনে এবং এর চতুঃসীমায় অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এগুলোর প্রতিপালন ও প্রচলনের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এক অভিযান চালানো উচিত। উত্তম হবে যদি বিয়ে-শাদির কিছু কাল পূর্বেই এই সংক্ষিপ্ত উপদেশমালা ছেপে বিয়ে-শাদির সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া যায়। "জাযাকুমুল্লাহু আহ্‌সানাল জাযা।" আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সাথী হোন, পদে পদে পথপ্রদর্শন ও সাহায্য করুন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে ইসলামের উচ্চাঙ্গীণ চারিত্রিক গুণাবলীর সত্যিকার 'রূহ্‌' বা মূল-মন্ত্রের হেফাযত ও স্থায়িত্বের পথে (আল্লাহ্‌র কাছে) গ্রহণযোগ্য খিদমত করার তওফীক দিন। —ওয়াস্‌সালাম

খাকসার— (মির্যা তাহের আহমদ)

খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

মিশর দেখে এলাম

মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

বাংলাদেশ সরকারের সৌজন্যে গত ১৫ই জানুয়ারী, ৯৪ইং দুই মাসের জন্য কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিমিত্তে সভ্যতা ও ফেরাউনের দেশ 'মিশরে' গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ হতে পি, আই, এ, করে করাচী ও মিশর বিমানে দুবাই হয়ে কায়রো। বিমানে প্রায় ১০ ঘন্টার পথ। দেখে এলাম সে লোহিত সাগর যার বুকে পাওয়া গিয়েছিল বেনজির দৃষ্টান্ত বিজড়িত মূসা (আঃ)-এর চরম শত্রু ফেরাউনের প্রাণহীন দেহ, যে শক্তিধর দেহ অসহায় লাশ হয়ে অদ্যবধি বিশ্বের তথাকথিত নাস্তিকতার ধ্বজাধারীগণের জন্য মহাপরাক্রমশালী খোদার অস্তিত্ব বহন করে কালের সাক্ষ্য হয়ে মিশরের যাদুঘরের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে চির নিদ্রিত অবস্থায় আছে, আরও দেখলাম ভূমধ্যসাগর নীলনদ ও সুয়েজখাল যার দৈর্ঘ ১৬৫ কিঃ মিঃ প্রস্থ ৩-৫ শত মিটার এবং তথাকার কিছু বড় বড় শহর, মমি, ভূমধ্যসাগরের পাড়ে দণ্ডায়মান আলেকজান্দ্রিয়া বাতিঘর, কৃষি মৎস্য ও জাতীয় যাদুঘর এবং পিড়ামিড, যার গায়ে রয়েছে গড়ে প্রতিটি আড়াই টন ওজনের আড়াই মিলিয়ন পাথর যার উচ্চতা প্রায় ২৩০-২৫০ মিটার।

নীল নদের পানিকে সম্বল করে কেবলমাত্র এর দু-পাশ এলাকাই চাষযোগ্য ভূমি, বাকী এলাকা বিস্তীর্ণ মরুভূমি যা চোখের দৃষ্টিতে সীমা রেখা টানা যায় না। বসতি এলাকায় কিছু গাছ-পালা আছে কিন্তু মরুভূমি বৃক্ষশূন্য। সারা বছরে কেবল শীতে ৫০-৭০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি হয়। সেপ্টেম্বর হতে এপ্রিল পর্যন্ত ভীষণ শীত অর্থাৎ তখন তাপমাত্রা ১২-১৫ ডিগ্রী সেঃ বাকী সময়টুকু গরম। রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাদের দেশগুলির মত তেমন প্রকট নয়। কথায় কথায় হরতাল কারফিউ মিছিল অনশন ধর্মঘট এবং প্রতিটি অফিসেই সংগঠন ও নির্বাচন নেই। কোন একটি দেয়ালের গায়ে কখনও একটি অক্ষর বা শ্লোগান লেখা নজরে পড়েনি। কদাচিৎ কয়েকটি পোষ্টার কেবল গোচরে পড়েছে। অট্টালিকার দেয়াল বা বাড়ীর প্রাচীরটি যে রং করা হয়েছে তা দীর্ঘ ৫-১০ বছর পরও একই চাকচিক্যে সুসজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার পাশেই আস্তাকুঁড়, প্রস্রাব খানা বা ঠেলাগাড়ীর ষ্ট্যাণ্ড নেই, বৃষ্টি নেই, ফলে শহরগুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে শহরতলী কিছুটা আবর্জনাময়। বড় শহরগুলিতে অত্যন্ত সুশ্রী অসংখ্য দালান যার প্রত্যেকটি ১০ ডলার কম নয়। সুশ্রী দালানগুলির নির্মাণ কৌশল দেখলে সত্যই আর্কিটেক্টদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে হয়, রাজধানীর প্রতিটি ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ে ৮-১০টি ওভার ফ্লাই অত্যন্ত চমকপ্রদ। রাতে প্রতিটি দোকানে শত শত বিদ্যুৎ বাতিতে আলোর মহাসমুদ্র আর সুন্দর সুন্দর

মূর্তিতে সজ্জিত। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তাদের লোক সংখ্যা ৫৭ জন এবং শিক্ষার হার ৪৮%। মেয়েরা রীতিমতই পুরুষের সাথে করমর্দন করে।

লেখার কলেবরকে নাতিদীর্ঘ করার লক্ষ্যে আমি কেবল ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করব। কারণ যাবতীয় বিষয়ে লিখতে গেলে লেখার পরিধি বিস্তৃত হয়ে যাবে।

মিশর একটি সুবিখ্যাত মুসলিম দেশ বটে কিন্তু এদের আচার আচরণ পোশাক পরিধেয় ইউরোপীয় দেশসমূহকে পর্যন্ত হার মানায়। প্রতিটি দোকানে রয়েছে অবিবাহিত সু-সজ্জিত ৫-৭টি মেয়ে, শুধু দোকানেই নয় রাস্তার পার্শ্বে মেয়েরা দোকান সাজিয়ে দিব্যি বেচাবিক্রি করছে। তারা ক্রেতাদের সাথে করমর্দন করে হাসিমুখে বরণ করে পণ্যাদি বিক্রির অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। দোকানে বেতারে বাজছে আল-কুরআন অথবা দেশীয় সঙ্গীত এবং রঙ্গীন টেলিভিশন। কৃষি পণ্যাদি বিক্রি করার জন্য মাথায় করে মেয়েরা বাজারে আসছে আবার কিছু ক্রয় করে মাথায় করে দীর্ঘপথ বেয়ে বাড়ী ফিরছে। গ্রাম্য মেয়েদের পরিধান হলো ম্যাক্সি কিন্তু মাথা উন্মুক্ত ক্ষেত খামারেও মেয়েরা রীতিমত কাজ করছে। শহুরে মেয়েরা হাঁটুর উপর পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট পরিধান করে, পা হতে হাঁটুর উপর পর্যন্ত লম্বা মোজা এবং পায়ে হিল জুতা। বুকে আদর্শ আবরণ নেই। হাঁটার পথে জুতোর কঠিন শব্দ ও কথা বলার উচ্চ কণ্ঠ মিলে রাস্তা সরগরম, যেন তাদের জন্যই কেবল এ চলার পথ। মহিলাদের জন্য বাসে আলাদা কোন আসন নেই। পুরুষেরা সিটে বসে আর তারই পাশে মহিলারা দুই সিটের মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে, এতে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

যোহরের আযান ১২-১০ মিনিটে এবং আসরের আযান হয় ৩-১৫ মিনিটের সময়। (তখন সন্ধ্যা হয় ৬-০০) সালাতের আকামত ও ইমাম সাহেবের কেরাত মাইকে প্রচারিত হয়। আকামত আযানের অর্ধেক। অর্থাৎ চারবার আল্লাহু আকবরের স্থলে দুইবার উচ্চারণ করে। তারা ২-পা বেশ ফাঁক রেখে নামাযে দাঁড়ায়। কেরাতের চেয়ে 'আমীন' বেশ জোরে এবং লম্বা সময় নিয়ে উচ্চারণ করে। নামাযের জন্য আলাদা কোন পোষাক পরার তেমন কোন প্রয়োজন মনে করে না। এমনকি শুক্রবারের নামাযের জন্যও কোন আলাদা কাপড় পরিধান করতে লক্ষ্য করা যায়নি। মাথায় টুপী ব্যবহার করে না বল্লেই চলে। শতকরা ২/১ জন মাথায় টুপী ব্যবহার করেন। মুখে দাঁড়ি আছে এমন একজন সহজে নজরে পড়ে না। মসজিদে মুক্তাদিগণের স্থান সংকুলান না হলে রাস্তা বা বাজার আঙ্গিনাতেই দাঁড়িয়ে পরে নামায শুরু করে দেন, ফলে রাস্তা বা বাজার কর্ম প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। অথচ হাদীসে আছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে পবিত্র স্থান হলো মসজিদ এবং অপবিত্র স্থান হলো বাজার। সেই বাজারেই তারা দাঁড়িয়ে যায় নামাযে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, শাবানের ১৫ তারিখের রজনী, যে রজনীতে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের 'ভাগ্য' বন্টন করা হয় বলে আমাদের দেশে প্রচলিত সে রজনীটি তারা পালন করে না। এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না বল্লেন, তারাই নন প্রশিক্ষণে আগত আরো কতিপয় মুসলিম সদস্য যেমন বেনীন ইন্দোনেশীয়ান সিয়েরালিয়ন ও চাদের মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। যে পবিত্র রজনীতে প্রতিটি মানুষের সারা বছরের ভাগ্য নির্ধারণ হয়, সে রজনী সম্পর্কে অমুসলমান থাক দূরের কথা অন্ততঃ মুসলমানগণ পর্যন্ত কিছুই জানে না এ ব্যাপারটা আমাকে বড়ই স্তম্ভিত করে। এ পবিত্র রজনী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা কেউ কিছুই জানে না বলে মন্তব্য করেছেন। এছাড়া মিশরীয়গণ আরো বলেন যে, তারা রমযানে তালাতা অর্থাৎ ৮ রাকাআত তারাবী সালাত আদায় করেন। অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ একই মন্তব্য করেন। তবে চাদের মুসলমানগণ আশারা অর্থাৎ ১০ রাকাআত তারাবী আদায় করেন। পাকিস্তানের এক বন্ধু জানান যে, তাদের দেশে কেউ কেউ ২০ রাকাআত এবং কেউ কেউ ৮ রাকাআত তারাবী পড়ে থাকেন। মিশরে রমযানের মধ্যেও খাবার দোকানগুলি খোলা ছিল।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, ওয়াক্তের নামাযের চেয়ে জুমুআর নামায পড়ার ব্যাপারে সকলেই অত্যন্ত যত্নশীল। মিশরসহ সকল দেশের মুসলিম প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যেই এ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আর নামায পড়ি বা না পড়ি রোযা না রাখলেই যেন নয় এমন একটি ভাব সকল মুসলমানগণের মধ্যেই বিরাজমান। আমার একই রুমে অবস্থানকারী পাকিস্তানী বন্ধু নামায এক ওয়াক্তও পড়েন নি কিন্তু রোযা একটিও ভঙ্গ করেন নি। আর রোযা রাখলাম বটে কিন্তু যত দেরীতে ইফতার করা যায় ততই যেন পুণ্য বেশী এ প্রবণতাও সবার মধ্যে বিরাজমান। বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমরা প্রায় ২৪টি দেশের লোক প্রশিক্ষণে এক সাথে ছিলাম; কিন্তু বেনীন ও ইন্দোনেশীয় মুসলিম মহিলা ও পাকিস্তানী মুসলিম প্রশিক্ষণার্থীগণের অশালীন কর্মকাণ্ডের ফলে অন্যান্য অমুসলিম প্রশিক্ষণার্থীগণ ইসলাম ধর্মকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যে মেতে গেলেন। তাদের অনেকেই আমার কাছে এসে অভিযোগ এনে বলছেন, মিঃ এলাহী, তোমরা তোমাদের ধর্মকে যতই আদর্শবান, নিষ্কলঙ্ক ও অন্যসব ধর্ম হতে উৎকৃষ্ট ভাবনা কেন। তোমাদের কার্যকলাপে তা প্রমাণিত হয় না। একমাত্র তুমি ব্যতীত আর সবই আদর্শহীন মুসলমান। ইসলাম অন্য সব ধর্ম হতে উৎকৃষ্টতম দাবী করলেও তার অনুসারীদের চরিত্র তা প্রমাণ করে না। আমরা কেবল তোমাকেই ব্যতিক্রম পেলাম। তাই আমরা তোমাকে শ্রদ্ধা করি এবং শ্রদ্ধা করতে ভাল লাগে। অন্যরা তেমন আদর্শবান মুসলমান নয়। এ মন্তব্যে আমি নির্জনে খুবই অনুতপ্ত হয়েছি। প্রথমে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আমাদেরকে বেশ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতেছিল। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে এমনি ধরনের অবাঞ্ছনীয় কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল তখন তারা

আমাদেরকে ন্যাক্কারজনকভাবে তিরস্কার করতে লাগল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যসব ধর্ম গলদপূর্ণ, কেবল ইসলামই উৎকৃষ্ট ধর্ম, সুতরাং সেই ধর্মানুসারীদের আখলাখ এমন কুৎসিত হবে কেন! অবশ্য এর জবাব আমার কাছে ছিল না। আমি যথাসম্ভব নিজেকে আহমদী মুসলিম পরিচয় দিয়ে তবলীগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় দুর্বলতার কারণে সব প্রশ্নের জবাব বা সব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে ইংরেজী অনূদিত জামাতী বই থাকলে অত্যন্ত ভালভাবে তবলীগ করা যেতো। সেখানে তবলীগের একটা বিশেষ সুযোগ ছিল। ইন্দোনেশীয়া ও সিয়েরালিওনের মুসলমান বন্ধুদের কাছে সেখানকার আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা জানান যে, "এই উভয় দেশেই প্রচুর আহমদী রয়েছে এবং তারা অত্যন্ত আদর্শবান মুসলমান। আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে জ্ঞান করি। তবে তারা আমাদের সাথে নামায পড়েন না।"

মিশরীয়গণ নামাযে কেউ কেউ ৩ বার কানে হাত তুলেন। তান্তায় একটি বিখ্যাত মসজিদে দেখলাম মেয়েদের জন্য নামায পড়ার আলাদা কোন পর্দার ব্যবস্থা নেই। তারা ছেলেদের পাশেই স্ব-স্ব ইমামতীতে ওয়াক্তের নামায আদায় করছেন। আবার কেউ কেউ এদিক সেদিক বসে তসবীহ যপ করছেন এবং কেউ কেউ বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সকল বিদেশী মুসলিম প্রশিক্ষণার্থীগণের বিশেষ অনুরোধে আমাকে ইমাম বানিয়ে নামায পড়া শুরু করে দিলেন, কিন্তু পরবর্তিতে পাকিস্তানের পাঞ্জাব হতে আগত এক বন্ধু উত্থাপন করলেন যে, মিঃ ইলাহী আহমদী (কাদিয়ানী)। তিনি আমাদের ইমামতীতে নামায পড়েন না। সকলেই জানেন যে, আমি আহমদী মুসলমান। কিন্তু তাদের ইমামতীতে নামায পড়ব না-তা তাদের জানা ছিল না। তারা এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলে আমার কৌশলগত উত্তরে অনেকটা অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে বলে তারা নিজেকে কিছুটা হেয় মনে করলেন এবং তৎপর হতে আমার ইমামতীতে নামায পড়া আর হলো না। আর সে-হতে বা-জামাত নামায আদায়ও সমাপ্ত হয়ে গেল। অন্য কেউ আর ইমামতীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না আর এমন কোন শ্রদ্ধাভাজন নামাযীও পাওয়া গেল না যাকে সকলে ভক্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইমাম বানাতে পারেন। তাই সেই হতে পুনরায় আলাদাভাবে নামায আদায় শুরু হয়ে গেল।

শ্রদ্ধেয় আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! ইহাই আমার মিশর ভ্রমণের অতি সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য যা আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। সাথে এ কথাও বলতে চাই যে, সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে আমি প্রতিটি আহমদী ভাই বোনের জন্য কায়মনে দোয়া করার চেষ্টা করেছি। এখন আমি তার বিনিময়ে আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই আমার পরিবারের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একান্ত দোয়া প্রার্থী। আশাকরি বঞ্চিত হবো না।

গুঁন্চা

(ফুল-কুঁড়ি)

(৫ থেকে ৭ বছরের ওয়াককে নও এবং অন্যান্য শিশুর জন্যে তা'লীম তরবীয়তি পাঠ্যসূচী)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

২য় কিস্তি

ফিরিশ্‌তাগণের ওপরে ঈমান

শিশু—ফিরিশ্‌তারা কারা ?

মা—যেভাবে খোদাতা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন .ঐভাবে ফিরিশ্‌তাগণকেও খোদা সৃষ্টি করেছেন।

শিশু—আমরা কি ফিরিশ্‌তাগণকে দেখতে পারি ?

মা—আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে দেখতে পারি না, কেননা তারা নূরের (আলোর) তৈরী আর আমাদের চোখ তাদেরকে দেখতে পারে না। হ্যাঁ, কখনও কখনও এরূপ হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে ফিরিশ্‌তা অন্য কোন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়, যেভাবে একবার রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) ধর্ম শিখাবার জন্যে একজন পুরুষ রূপে এসেছিলেন। উপস্থিত সবাই তাঁকে দেখেছিলেন।

শিশু—ফিরিশ্‌তারা কি করেন ?

মা—ফিরিশ্‌তারা কয়েক প্রকার কাজ করে থাকেন। কতক ফিরিশ্‌তা খোদাতা'লার বাণী মানুষের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। কতক ফিরিশ্‌তা মানুষের অন্তরের মধ্যে ভাল ভাল কাজ করার উদ্রেক করে দেন। কতক ফিরিশ্‌তা এমন সব কাজে নিয়োজিত আছেন যেমন, পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা, বৃষ্টির ফিরিশ্‌তা।

শিশু—ফিরিশ্‌তারা কতজন ?

মা—ফিরিশ্‌তা অগুণ্‌তি। চাহিদানুযায়ী প্রত্যেক যুগে যুগের অসংখ্য ফিরিশ্‌তা কার্যরত রয়েছেন। এখন তুমি বলতো দেখি আমি তোমাকে যে চারজন বিখ্যাত ফিরিশ্‌তার নাম বলেছি তাঁদের নাম কি কি ?

শিশু—হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)—খোদাতা'লার কথা মানুষের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন। হযরত আযরাঈল (আঃ)—মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণ সংহার করেন। হযরত মিকাঈল (আঃ)—রিয্‌ক পৌঁছান। হযরত ইসরাফীল (আঃ)—কিয়ামত (অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।

মা—আর কোন কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করো যা ফিরিশ্‌তারা করে থাকেন?

শিশু—সর্বদা দরূদ [রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতের জন্যে আশিস ও কল্যাণ কামনা করা—অনুবাদক] পড়েন। আর যখন আমরা দরূদ পাঠ করি তখন ফিরিশ্‌তা আমাদের প্রিয় প্রভুকে গিয়ে বলেন যে, আপনাকে তোহ্‌ফা (উপহার) পাঠানো হয়েছে। আমার নাম উল্লেখ করে ইহা বলেন।

মা—কেবল তোমারই নয় তোমার আব্বুরও। ফিরিশ্‌তা বলেন যে, ঐ ব্যক্তির পুত্র দরূদ এবং সালামের তোহ্‌ফা পাঠিয়েছেন।

শিশু—ফিরিশ্‌তারা কি নামাযও পড়েন?

মা—ফিরিশ্‌তারা ঐ কাজই করতে থাকেন যেজন্যে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদেরকে আদেশ দিয়েছেন। খোদাতা'লা ফিরিশ্‌তাগণকে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত (উপাসনা) করেন।

শিশু—মানুষ এবং ফিরিশ্‌তার মধ্যে পার্থক্য কি?

মা—প্রথম পার্থক্য তো ইহাই যে, মানুষ মাটি থেকে তৈরী আর ফিরিশ্‌তা নূর থেকে তৈরী। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে যে, সঠিক রাস্তা কোন্‌টি এবং ভুল রাস্তা কোন্‌টি। ফিরিশ্‌তারা তাই করেন যা তাঁদেরকে আদেশ দেয়া হয়। পুনরায় ইহাও একটি পার্থক্য যে, মানুষকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সময় লাগে, কিন্তু ফিরিশ্‌তাগণ সাথে সাথে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন।

আল্লাহ্‌তা'লার কিতাবসমূহের ওপরে ঈমান

শিশু—আল্লাহ্‌তা'লার কিতাবসমূহ কি কি?

মা—যখন আমরা আল্লাহ্‌তা'লার কিতাবগুলো সম্বন্ধে বলি তখন কোন এমন কিতাবের কথা বলি না যা আল্লাহ্‌তা'লা কোন লিখক দিয়ে লিখিয়েছেন বা নিজেই লিখে ও ছাপিয়ে পাঠিয়েছেন। বরং আল্লাহ্ তাঁর পুণ্যবান ও পবিত্র নবীগণকে উত্তম কথা-বার্তা শিখিয়ে থাকেন যা তারা লিখে একখানা কিতাব তৈরী করে নিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লার কথাকে 'ওহী' অথবা 'ইলহাম' বলে। ঐ ওহীগুলোকে একত্র করেই কিতাব সৃষ্টি হয়।

শিশু—ওহী কাকে বলে?

মা—যখন আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে কোন উত্তম কথা শিখাতে চান তখন তিনি নিজের নবী বা রসূলকে ফিরিশ্‌তাগণের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠান উহাকে 'ওহী' বলা হয়।

শিশু—আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কে ওহী নিয়ে আসতেন।

মা—হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিয়ে আসতেন। আমি তোমাকে বলেছি না যে, একদিন হেরা গুহায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন তখন একজন ফিরিশ্‌তা আসলেন। তিনিই তো ছিলেন হযরত জিব্‌রাইল (আঃ)। আর তাঁকে (সাঃ) বলেছিলেন, 'ইকরা' (পড়ুন)। পরে সারা জীবন এই ফিরিশ্‌তা তাঁকে (সাঃ) খোদাতা'লার বার্তা পৌঁছাতে ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা ওহীর মধ্যে ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

শিশু—তা হলে কথা দাঁড়াল এই যে, হুযুর (সাঃ)-কে ফিরিশ্‌তা অনেক কিছু শিখিয়েছেন।

মা—জ্বি হ্যাঁ, এসব কিছু আমাদের প্রিয় প্রভু [রসূলে করীম (সাঃ)] লিখিয়েছেন। উহাকেই আমরা কুরআন মজীদ বলে থাকি। পুরো তেইশটি বছর ধরে অর্থাৎ যতদিন তিনি (সাঃ) জীবিত ছিলেন কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হচ্ছিল। আমাদের ঈমান এই যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র কালাম (কথা)। ইহা সত্য। কেয়ামত অব্দি ইহা সংরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে কেউ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবে না।

শিশু—কুরআন মজীদের পূর্বেও কি আল্লাহ্‌তা'লা কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন?

মা—হযরত মূসা (আঃ)-কে তওরাত দিয়েছিলেন। আবার হযরত ঈসা (আঃ)-কে এই তওরাতই তাঁর সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী শিখিয়েছেন। হযরত দাউদ (আঃ)-কে পবিত্র সংগীত শিখিয়ে ছিলেন যা যবূর নামে একীভূত করা হয়েছে।

শিশু—আমরা ঐ সবের ওপরে ঈমান রাখি।

মা—এ সব কিতাবই খোদাতা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনটিই নিজের আসল রূপে থাকতে পারে নি। পুনরায় খোদাতা'লা সর্বকালে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে আমাদের প্রিয় কিতাব কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্‌তা'লার রসূলগণের ওপরে ঈমান

মা—তুমি জান কি নবী বা রসূল কাকে বলা হয়?

শিশু—ভালভাবে জানা আছে। খোদাতা'লার বাণী বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর কাজ যারা করে থাকেন তাঁরাই রসূল বা পয়গম্বর। নবী কাকে বলে আপনি বলে দিন।

মা—নবী বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি খোদার নিকট থেকে অদৃশ্য জগতের খবরসমূহ জানতে পেরে অন্যের নিকটে পৌঁছিয়ে দেন।

শিশু—খোদার নবী কেন আসেন তাও আমার জানা আছে। যখন লোক খোদাকে ভুলে যায়, খারাপ কাজ করে তখন আল্লাহ্‌ পাক তাদের মধ্য থেকে একজন অতীব পুণ্যবান ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁকে নবী মনোনীত করেন।

মা—সর্বৈব ঠিক বলেছো। নবীকে অনেক কাজ করতে হয়, আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ এই

যে, ইহা করো না, এভাবে করো, লোকদেরকে বলো.....তাদের মধ্য থেকে মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে তাদেরকে পবিত্র করো আর খোদাতা'লার দেয়া বাণীসমূহ তাদেরকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলো। ঐ অনুযায়ী কাজ করা শিখিয়ে দাও।

শিশু—নবী তো কখনও কোন খারাপ কাজ করেন না।

মা—বৎস! কখনও না। নবী খারাপ কাজ করার কথা কখনও চিন্তাও করতে পারেন না। আল্লাহ্ পাকের ফিরিশ্তারা তাঁদেরকে সর্বদা ভাল থেকে অধিকতর ভাল কথা শিখাতে থাকেন। তাঁদের হৃদয় পবিত্র হয়ে থাকে। তাঁরা কেবল সেসব কাজই করে থাকেন যা আল্লাহ্তা'লা তাঁদেরকে শিখিয়ে থাকেন।

শিশু—নবীদের ওপরে ঈমান আনা কেন আবশ্যক, আম্মু?

মা—আসল কথা তো খোদাতা'লার ওপরে ঈমান আনা। যখন পর্যন্ত আমরা তাঁর শক্তি-সমূহ, তাঁর কুদরতের মহিমাসমূহ, তাঁর সৌন্দর্যসমূহ ও তাঁর গুণাবলীর জ্ঞান লাভ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবো না। নবীদের ওপরে ঈমান আনার পরে আমরা জানতে পারি যে, খোদা কীরূপ হবেন।

শিশু—এখন আপনি দৃষ্টান্ত দিন যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কীরূপ দয়াময় ও করুণার আধার ছিলেন। খোদাতা'লা তাঁর চেয়েও অধিক দয়াময়, তাই না আম্মু?

মা—সাবাস, তোমার অবশ্যই নবীদের সংখ্যাও মনে আছে।

শিশু—এক লাখ চব্বিশ হাজার।

মা—এখনই আমি তোমাকে বিখ্যাত নবীদের নাম বলে দিচ্ছি। আর তাঁদের সবার জীবন-বৃত্তান্তও শুনাব। তুমি আমার সাথে আবৃত্তি করতে থাকো। তোমার জানা আছে যে, যখন কোন নবীর নাম নেয়া হয় তখন, 'আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম' বলতে হয়।

হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা খাতামান্নাবীঈন সব নবীদের সর্দার (নেতা) সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

শিশু—সকল নবী একইভাবে খোদাতা'লার প্রিয় কি?

মা—সকল নবীই খোদাতা'লার নিকট প্রিয়; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সব নবীদের সর্দার ও বাদশাহ। খোদাতা'লা প্রত্যেক নবীকে কোন না কোন বড় গুণ দিয়েছেন কিন্তু আমাদের নেতাকে সকলের গুণাবলী একত্র করে এবং বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্তব্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের নবম বর্ষের ঘোষণা করতে গিয়ে তাহরীকে জাদীদের মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে বলেন:

"তাহরীকে জাদীদ সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য কেবল জামাতের মধ্যে সাদা-সিদে জীবন ধারণের অভ্যেস সৃষ্টি করাই নয় বরং আমার উদ্দেশ্য তাদেরকে কুরবানীর তন্দুরের (রুটি সেঁকার বিশেষ চুলা) নিকট দাঁড় করানো কেননা যখন তাদের চোখের সামনে কতক লোক ঐ আগুনে ঝাঁপ দেয় তখন তাদের প্রাণেও আগুনে ঝাঁপ দেবার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর তারাও যেন ঐ আবেগের মাধ্যমে কাজ নিয়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেয় এবং নিজেদের প্রাণকে ইসলাম ও আহমদীয়্যতের জন্যে বিসর্জন দেয়। যদি আমরা আমাদের নিজের জামাতের লোকদেরকে এই অনুমতি দিয়ে দিই যে, তারা আরামে বাগান-বাড়ীতে বসে থাকুক তাহলে গরমে কাজ করার জন্যে তারা প্রস্তুত হবে না এবং হীনমন্যদের ন্যায় পিছে সড়ে বসে যাবে; কিন্তু এখন জামাতের সকল ব্যক্তিকে কুরবানীর জন্যে তন্দুরের নিকট দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, কেননা যখন তাদের নিকট কুরবানীর ডাক আসবে তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও আগুনে ঝাঁপ দিবে। সুতরাং যখন কুরবানীর সময় এসেই গেছে তখন এ প্রশ্ন উঠবে না যে, কোন্ মুবাল্লেগ কখন ফেরৎ আসবে। ঐ সময় ফেরৎ আসার প্রশ্ন নিরর্থক হবে। দেখে নাও, খৃষ্টানগণ যখন তবলীগ করেছে তখন এই রঙ্গেই করেছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যখন কোন হাওয়ারী [হযরত ঈসা (আঃ) এর শিষ্য] বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন এলাকায় তবলীগের জন্যে গিয়েছেন তখন এরূপ হয়নি যে, সে ফেরৎ এসে গেছে। বরং আমরা ইতিহাসে ইহাই পড়ে থাকি যে, অমুক প্রচারককে অমুক স্থানে ফাঁসি দিয়ে দেয়া হয়েছে আর অমুক প্রচারককে অমুক স্থানে কয়েদ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের বন্ধুরা একথার ওপরে খুশী থাকেন যে, সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেব শহীদ (রহঃ) সেলসেলার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যদিও জামাতে একজন আবদুল লতীফই নয়, জামাতকে জীবিত করার জন্যে হাজারো আবদুল লতীফের প্রয়োজন যারা বিভিন্ন দেশে যায় আর নিজ নিজ জীবন ইসলাম ও আহমদীয়্যতের জন্যে কুরবানী করে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক এলাকায় আবদুল লতীফ জন্ম লাভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়্যতের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আহমদীয়্যতের প্রভাব তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন সকল লোককে ঘর থেকে বের করে একটি মাঠে কুরবানীর আগুনের কিনারায় দণ্ডায়মান করে দেয়া যায়। এমতাবস্থায় প্রথম উৎসর্গকারী জীবন উৎসর্গ করলে অন্যান্যরা তাকে দেখে নিজেরাই আগুনে ঝাঁপ দেয়া শুরু করবে আর এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যেই আমি তাহরীকে জাদীদ জারী করেছি।"

এখনও আমাদের জন্যে উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তবুও আমাদেরকে সর্বদা উপরোক্ত অবস্থায় নিজেদের জীবন কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এর স্বীকৃতি ও টোকেন স্বরূপ আসুন না আজই আমরা আমাদের ওয়াদাকৃত তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দিই। এখানে উল্লেখ থাকে যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বছর ৩১শে অক্টোবর শেষ হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাকে তাঁর পথে কুরবানী করার সৌভাগ্য দান করুন।

মীর মোহাম্মদ আলী
সেক্রেটারী, তাহরীকে জাদীদ

সংবাদ

লণ্ডন জলসা-৯৪

আগামী ২৯-৩১শে জুলাই যুক্তরাজ্য জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার উপস্থিতিতে এ জলসা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করবে। এ জলসায় বিশ্বের ১৪০টি দেশ থেকে আহমদী মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করবেন। এ সময়ে আন্তজাতিক বয়াত অনুষ্ঠানও পরিচালিত হবে যুগ-খলীফার পবিত্র হস্তে। জলসা এবং আন্তজাতিক বয়াতের প্রোগামগুলো মুসলিম টিভি আহমদীয়ার (MTV) মাধ্যমে সরাসরি প্রচারিত হবে ইনশাআল্লাহ্। সবাকে ইহা দেখার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সর্বোপরি এ জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আহমদী বার্তা

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী হযরত মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন!

"হযরত মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহু (সবুজ পাগড়ী ধারী) দীর্ঘ দিন রোগে ভোগার পরে গত ১০১ বছর বয়সে ১৯শে জুন, ১৯৯৪ ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) ঐশী ডাকে সাড়া দিয়েছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

তিনি ১৮৯৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর হযরত মসীহ মাওউদ ও মাহদী মাহুদ (আঃ)-কে ১৯০১ সনে দেখার সৌভাগ্য হয়। ১৯০২ সনে তিনি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অক্টোবর ১৯৪৭ সনে তিনি হিজরত করে কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে গমন করেন।

তার পিতা ছিলেন বাটালার হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ বখ্‌শ (রাঃ)। তিনি ঐ বুযর্গ ছিলেন যিনি বিখ্যাত মাটিন ক্লার্ক এর মোকদ্দমার সময়ে (আগষ্ট ১৮৯৭) মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালভীকে তাঁর চাদর থেকে এই বলে উঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'উঠো আমার চাদর ছেড়ে দাও। যে খৃষ্টানদের সাথে মিশে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে এসেছে তাকে বসতে দিয়ে আমি আমার চাদরকে কলুষপূর্ণ করতে পারি না।' (সূত্রঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) আল ফযল ২৪ সংখ্যা ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠা ৭-৮)

১৯০১ সনে হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ বখ্‌শ সাহেব (রাঃ) বাটালা থেকে হিজরত করে কাদিয়ান আসলে হযরত মৌলবী সাহেবের ১৯০২ থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত হযরত মসীহ্

মাওউদ (আঃ)-এর কল্যাণমণ্ডিত মজলিসে বসার এবং হযরত আকদসের পবিত্র মুখের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ কথাবার্তা শুনার অনেক মূল্যবান সুযোগ লাভ হয়। প্রথম থেকেই তিনি একজন উদ্যোগী দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে তিনি বসরা গমন করেন এবং জেনারেল ফেড়াওর অধীনে মিস্তরীর দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে গয়ের আহমদী মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে জোরে শোরে তবলীগ করতে থাকেন এবং ১৯১২ সনে কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

এপ্রিল ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদে রত থাকেন তিনি। এ সময়ে তিনি বড় বড় তবলীগের কর্মকাণ্ডে যোগদান করেন। আর্য-সমাজীদের সাথে সফল মোনাযেরা করেন। বহু নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করান এবং মালকানার মুসলমান-দের পুনরায় ইসলামের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁকে পুরী, ফরখাবাদ ও হেটিয়া এলাকার আমীরুল মুজাহেদীন পদে নিযুক্ত করেন।

এখান থেকে বদলীর পরে কেন্দ্রের তরফ থেকে তাঁর লুধিয়ানা, আম্বালা, পাতিয়ালা ও ডোহরী পরগণায় অতি জাঁকজমকের সাথে সত্যের বাণী পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ হয়।

জুলাই ১৯৩৩ থেকে জুলাই ১৯৩৭ পর্যন্ত (ওয়াকফে আরযী প্রোগ্রামে যখন তিনি কারনাল প্রভৃতি স্থানে নিয়োজিত ছিলেন) হযরত মোলবী সাহেব কাশ্মীর এলাকায় জলসা, মোনাযেরা, সাক্ষাৎকার এবং নিজ পবিত্র আদর্শ ও দোয়া দ্বারা আহমদীয়্যতের ঢাক বাজিয়ে দেন এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত আত্মা তাঁর মাধ্যমে বগোশ এলাকায় আহমদী হন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তিনি ক্যাম্বেলপুর, ঝিলাম ও গুজরাট সফর করে সেখানকার আহমদী মোহাজেরদের দুঃখ দুর্দশা দূর করে জামাতী নেযামকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রশংসনীয় খেদমত দান করেন। পরে এক দীর্ঘ কাল সময় ধরে তিনি নেযারতে ইসলাহ ও ইরশাদের অধীনে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকায় আহমদীয়্যতকে বিস্তার দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত থাকেন। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ শান ও শওকতের সাথে সমাধা করেন।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশে সিডনীতে (অষ্ট্রেলিয়া) নতুন মসজিদ বায়তুল মাহদীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এর পরে ১৯৮৯ সনে শত বার্ষিকী জুবিলী জলসায় যোগদানের জন্যে বৃটেনে গমন করেন। হুযূর (আইঃ) তাঁকে ষ্টেজের ওপরে বসান এবং বলেন—

"এখন আমি আপনাদের সামনে এমন এক ব্যক্তিকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যিনি ঐশী রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আগমন করেছেন।"

এরপরে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা-নুযায়ী দারুল আমান কাদিয়ানে শত বার্ষিকী জলসা উপলক্ষ্যে ১৯৯১ সনে কাদিয়ান গমন

করেন সেখানে হাজার হাজার দর্শক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ আত্মবিলীন সাহাবীর দর্শন লাভ করে তাবেয়ীনগণের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্মান লাভ করেন।

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া এই যে, তিনি যেন মরহুম হযরত মৌলবী সাহেবকে স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে উচ্চ মকামসমূহ দান করেন আর তাঁর সকল উত্তরাধিকারী ও নিকটবর্তীগণকে সাব্‌রে জামীল দান করেন"।

(২৪-৬-৯৪ তারিখের ইন্টারন্যাশনাল আল ফযলের সৌজন্যে)

সন্তান লাভ

গত ২২-৬-৯৪ ইং তারিখে রোজ বুধবার রাত ১১-২৩-মিনিটে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এক পুত্রসন্তান দ্বারা ভূষিত করেন (আল্‌হামদুলিল্লাহ্)। আল্লাহ্‌তা'লা যেন আমার এই পুত্র সন্তানকে দীর্ঘায়ু দান এবং ইসলামে বিশেষ খেদমত করার সুযোগ দান করেন সেজন্য আহ্‌মদী জামাতের খেদমতে বিশেষ দোয়াপ্রার্থী।

উল্লেখ্য, এই সন্তান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাক্তন আমীর মরহুম সালাহউদ্দীন চৌধুরীর পৌত্র।

তারেক আহ্‌মদ চৌধুরী
আঃ মুঃ জাঃ, রাজশাহী

তবলীগ প্রসংগে
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র রাবে' (আইঃ)-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

"হে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসগণ! এবং হে দীনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালামের (প্রেমের) মাতালগণ! এ ধারণাকে পরিত্যাগ করো যে, তোমরা কিইবা করছো আর তোমাদের দায়িত্বে কিইবা ন্যস্ত করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মুবাল্লেগ (প্রচারক) এবং প্রত্যেককেই খোদার সমীপে জবাবদেহী করতে হবে। তোমাদের যে কোন পেশা হোক না কেন; যে কোন কাজই তোমরা করনা কেন, দুনিয়ার যে কোন অংশে তোমরা বসবাস কর না কেন, যে কোন জাতির সাথে তোমরা সম্পৃক্ত হও না কেন তোমাদের প্রথম কর্তব্য ইহাই যে, দুনিয়াকে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে আহ্বান করো আর তাদের মধ্যেকার অন্ধকারকে আলোকে পরিবর্তিত করে দাও এবং তাদের মৃত্যুকে জীবনে রূপান্তরিত করে দাও। আল্লাহ্ করুন যেন এরূপই হয়।"

(১৯৮৩ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত জুমুআর খুতবা থেকে)

আস্‌হাবে কাহাফের পাতা

আবুরকীম

ব্লাসফেমী ও মুরতাদের শাস্তি

ব্লাসফেমী শব্দটি ইংরাজী। এটি খৃষ্টানদের দ্বারা রচিত, প্রবর্তিত একটি খৃষ্টানী আইন। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, In the Christian religion, blasphemy has been regarded as a sin by moral theologians ; ST. Thomas Aquinas, described it as a sin against faith·····The mosaic Law decreed death by stoning as the panalty for the blasphemer. Under Emperor Justinian I (reigned 527-565) the death panalty was decreed for blasphemy. (The New Encyclopaedia Britanica, VOL. 2 : P-276). এখানে বলা হয়েছে, সেন্ট থমাস একুইনাস ব্লাসফেমীকে পাপ বলেছেন। ইহুদী আইনে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সম্রাট প্রথম জাষ্টিনিয়ান এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্দ্ধারিত করেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই থেকে খৃষ্টধর্মে ব্লাসফেমী আইন চালু হয়েছে।

আইনে বলা হয়েছে,—Every publication is said to be blasphemous which contains matter relating to God, Jesus Christ, The Bible, or the book of common prayer intend to wound feelings of mankind or to excite contempt and hatred against the Church by law established or to promote immorality (The Law Lexicon : P-142)।

অর্থাৎ—এমন কোন প্রকাশনা যাতে ঈশ্বর, যীশু খৃষ্ট, বাইবেল অথবা অন্য কোন প্রার্থনা পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থ—যা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের অনুভূতিকে আহত করে, অথবা চার্চের বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি করে অথবা চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটায় তাই ব্লাসফেমী। আমাদের দেশের মোল্লারা এখন এই আইনটি বাংলাদেশে প্রবর্তন করতে আন্দোলনে নেমেছেন।

তবে প্রশ্ন হলো, ব্লাসফেমী শব্দের কোন প্রতিশব্দ কি কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায়? Dictionary of Islam এ বলা হয়েছে—Blasphemy—Arabic Kufr—to hide (the truth) (Page-43) বলা হয়েছে, ব্লাসফেমীকে আরবীতে কুফর বলে। কথাটা সঠিক নয়। কুফর অর্থ অস্বীকার করা, ঢেকে থাকা। ব্লাসফেমী অর্থ কখনও কুফর নয়। কুফরের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী মৌলবী মোল্লাদেরও নেই। অতএব, ব্লাসফেমী ও কুফর এক কথা নয়।

ইনকিলাব পত্রিকা কুরআনের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করে সংগ্রামে প্রকাশিত প্রবন্ধের আলোকে তৎসঙ্গে নিজেদের অপব্যাখ্যা যুক্ত করে বলেছে যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বৈ অন্য কিছুই নয়। আমরা হুবহু ঐ সব উদ্ধৃতি এবং তাদের সংযুক্ত মতামত পাঠকদের অবগতির জন্য পেশ করলাম। উল্লেখ্য যে, কুরআনে কোথাও মুরতাদের বা ধর্মনিন্দার

শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নেই। মোল্লারা পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা করে নিজেরা মনগড়া অর্থ করে কতিপয় যয়ীফ হাদীসকে অবলম্বন করে খৃষ্টানদের মতো ব্লাসফেমীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত করে। এখন ৩০শে জুনের ইনকিলাব থেকে উদ্ধৃত করছি,—

(১) 'তোমাদের মাঝে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকালে ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, এরাই জাহান্নামী সেথায় তারা স্থায়ী হবে।' (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২১৭-এর শেষাংশ) এ আয়াতে বর্ণিত ইহকালে কর্ম নিষ্ফল হওয়ার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা।

(২) ঈমান গ্রহণের পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (আলে ইমরান আয়াত ৮৬) এ আয়াতে মুরতাদকে ক্ষমার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

(৩) এরাই তারা যাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের উপর আল্লাহ্, ফিরিস্তাগণ এবং মানুষ সকলেরই লানত। (আলে ইমরান, আয়াত ৮৭) এ আয়াতে লানত অর্থাৎ দুনিয়াতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা।

(৪) তারা এতে (দোযখে) স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না (আলে ইমরান, আয়াত ৮৮) পরকালের অনন্তকাল শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতীত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আলে ইমরান, আয়াত ৮৯) অত্র আয়াতে মুরতাদ হওয়ার পরে যদি তওবা করে, তবে তাকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে।

(৬) ঈমান গ্রহণের পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনও কবুল হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট (আলে ইমরান আয়াত ৯০)।

(অত্র আয়াতে যারা বারবার মুরতাদ হয় অর্থাৎ যাদের ধর্মত্যাগ একাধিকবার ঘটে, তাদের তওবা কবুল হবে না। ঘোষণা করা হয়েছে, অতএব তার মৃত্যুদণ্ড কোনভাবেই রহিত হবে না।)

(৭) যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের পক্ষে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও কখনও তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, এদের কোন সাহায্যকারী নেই (আলে ইমরান, আয়াত ৯১)।

(৮) যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে আহ্বান করা হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ ধর্মত্যাগ, শিরক, কুফরী) প্রত্যাবৃত্ত হয়। যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তির (ইসলাম গ্রহণের) প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে এবং তোমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) এদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি (নিসা, আয়াত ৯১)।

(৯) যারা ঈমান গ্রহণ করে ও পরে কুফরী করে (মুরতাদ হয়ে যায়) এবং আবার ঈমান গ্রহণ করে, আবার কুফরী করে (মুরতাদ হয়ে যায়) অতঃপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি (মুরতাদ হওয়ার প্রবণতা) বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন না (নিসা আয়াত ১৩৭)।

(১০) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (বিরোধিতায় লিপ্ত হয়) এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এ হল তাদের লাঞ্ছনা পরকালেও তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে (মায়িদা, আয়াত ৩৩)।

(১১) হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে (মুরতাদ হয়ে গেলে) আল্লাহ্ (মুরতাদদের ধ্বংস করে) এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এসব আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় (মায়িদা, আয়াত ৫৪)।

(১২) অতঃপর তারা (যদিও তারা চুক্তি ভংগকারী এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী-তবুও) যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে ভাই। আমিতো জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান সম্প্রদায়ের জন্যই আমার নির্দেশসমূহ বর্ণনা করে থাকি। তারা যদি নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং দ্বীনের অপবাদ রটিয়ে দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তাহলে কাফির (তথা মুরতাদদের) নেতাদের হত্যা কর। তাদের ব্যাপারে আর কোন প্রতিশ্রুতি থাকলো না। হতে পারে তারা (কঠোর শাস্তি প্রয়োগে) নিজেদের অপকর্ম থেকে বিরত হবে। তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে ও রাসূলকে বহিষ্করণের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে? তারাই তোমাদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের সূচনা করেছিল। এ সকল লোকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে তোমরা কি ভয় পাচ্ছ? সত্যিকারের মুমিন যদি হও, তবে (তাদেরকে নয়) একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় কর।

তোমরা তাদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হও। তোমাদেরই হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে তোমাদেরকে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। এভাবেই (মুরতাদ-কাফিরদের ধ্বংস করে) আল্লাহ্ মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন (সূরা তাওবা আয়াত ১১-১৪)।

১১ নং আয়াতে যে চুক্তিভংগের কথা বলা হয়েছে, তাফসিরবিদগণ এর অর্থ ইরতেদাদ তথা মুরতাদ হওয়া অর্থে সাব্যস্ত করেছেন।

(১৩) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করল (মুরতাদ হয়ে গেল) এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে এ শাস্তি থেকে সে ক্ষমা পাবে, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত (নাহল, আয়াত ১০৬)।

সুধী পাঠকবৃন্দ! সূরা বাকারার ২১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন এদের শাস্তি জাহান্নাম। আর ইনকিলাব বলছে, এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আলে ইমরান, ৮৬ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, জালিম সম্প্রদায় সং পথ প্রাপ্ত হয় না। আর ঐ লেখক বলছেন, মুরতাদরা ক্ষমার অযোগ্য। ৮৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, এহেন লোকদের উপর লানত। আর ইনকিলাব পন্থী মোল্লা সাহেব বলছেন, লানত (অভিশাপ) অর্থ মৃত্যুদণ্ড। আলে ইমরান ৯০ নম্বর আয়াতে আছে, এরা পথভ্রষ্ট। আর লেখক সাহেব বলছেন, এদের মৃত্যু দণ্ড রহিত হবে না। সূরা তওবার আয়াতটিতে এবং সূরা মায়েদার আয়াতে মুরতাদের উল্লেখ মাত্র নেই। এখানে যুদ্ধ ঘোষণাকারী, ওয়াদাভঙ্গ করে ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের কথা বলা হয়েছে। লেখক বন্ধনীর মধ্যে ইচ্ছামত 'মুরতাদ' শব্দটি লিখে দিয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কোন খোদাভীরু লোক কি এমনটি করতে পারে? আসলে ইনকিলাব পন্থী এবং সংগ্রাম পন্থীরা ইসলাম ইসলাম করলেও এরা ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী। তা না হলে কুরআনকে কি এভাবে তারা বিকৃত করতে পারে?

সাধারণতঃ মোল্লাদেরকে মৌলবাদী বলা হয়, অথচ মূলের সঙ্গে এদের দূরতম সম্পর্কও নেই। মৌল, মূল বা মৌলিকতা এই তথাকথিত মৌলবাদে নেই। মূলকে বাদ দিয়েই এরা মৌলবাদী। পবিত্র কুরআনের এই সব আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করার পর কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়ছে যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডরূপে স্বীকৃত।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীস মাত্রই সহী নয়। বহু জাল, যয়ীফ, মওযু, হাসান অর্থাৎ মিথ্যা ও দুর্বল হাদীস রয়েছে। যিন্দিকরা বার হাজার হাদীস জাল করে (পৃথিবী: আগষ্ট ১৯৮৩) নিজেদের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ হাদীস তৈরী করা হয়েছে (ঐ দ্রষ্টব্য)। অতএব কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধে কোন হাদীস গ্রহণীয় হতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে আর কোন হাদীস বা কথা গ্রহণীয় হবে? (জাসিয়া, ১ রুকূ)। সংগ্রাম পন্থীদের গুরু মৌদুদী সাহেব বলেছেন, বোখারী শরীফের হাদীস হলেও বিচার বিবেচনা না করে তা গ্রহণ করা উচিত নয় (তর্জমানুল কুরআন)। ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেছেন, "কারো বাক্যে নয় শত নিরানব্বই ভাগ কুফুরীর সম্ভাবনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুরতাদ বা কাফির বলা যাবে না (নকশে হায়াত, ১০৬১ পৃঃ)। দেওবন্দের ফতোয়ায় বলা হয়েছে, যদি ৯৯% ভাগ কাফির বলার সম্ভাবনা থাকে আর ১% ভাগ কাফির না বলার অবকাশ থাকে তাহলে কাফির না বলাই বাঞ্ছনীয় (ফতোয়া দারুল উলুম, ৪৪০/১২)।

পূর্বে আমরা মুরতাদ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করেছি। বর্তমানে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আরো কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলাম।

আশা করি মৌলবী মোল্লা সাহেবরা যাকে ইচ্ছা তাকে কাফের মুরতাদ বলা থেকে বিরত থাকবেন। একবার যদি মুরতাদ বানাবার কারখানা চালু হয়ে যায় তাহলে একজন মুসলমানও আর অবশিষ্ট থাকবে না। একে অপরকে ফতওয়া দিয়ে সবাই কাফের অথবা মুরতাদ হয়ে যাবে। শীয়াদের কিতাবে আছে, মহানবীর (সাঃ) ইনতেকালের পর নাকি মাত্র তিনজন সাহাবী ঈমানদার ছিলেন। বাকী সকল সাহাবীই মুরতাদ হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ) (আর রাউযা, ১১৫/৩)।

আল্লাহ্‌তা'লা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে শুভ বুদ্ধি দান করুন, আমীন।

সম্পাদকীয় ঃ

হরতালের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নূতন পদ্ধতি

বাংলাদেশের মৌলবী মোল্লারা ৩০শে জুন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে হরতাল পালন করেছেন। ইতিপূর্বে ইসলামের নামে এভাবে আর হরতাল পালিত হয়নি।

আমাদের দেশে হরতাল একটি নিত্যদিনের ঘটনা। যে কোন কারণে হরতাল ডাকলেই হরতাল হয়ে যায়। কারণ মানুষ জান মালের ভয়ে হরতাল ভঙ্গ করে না। হরতালের দিনে গাড়ী ভাঙ্গা হয়, দোকানপাট লুণ্ঠন করা হয়। রাস্তা ঘাটে বোমাবাজি করা হয়। অতএব, নিরাপত্তার অভাবে হরতালের দিনে গাড়ী, রিক্সা চলে না, দোকান পাট খোলে না।

হরতাল শব্দটি গুজরাটি। এর অর্থ জোট বেঁধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। গান্ধীজি ১৯১৯ সালে সর্ব প্রথম এর প্রচলন করেন। গান্ধীজির মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি। আর এ কারণেই এই গুজরাটি শব্দটি রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়ে যায়। এর আর এক নাম ধর্মঘট। ধর্মে এর উল্লেখ না থাকলেও এর নাম ধর্মঘট। কোন ধর্মেই ধর্মঘট বা হরতাল নেই। ইসলামের সঙ্গে তো এর দূরতম সম্পর্কও নেই। কিন্তু আখেরী যমানার উলামারা এই হরতাল, ধর্মঘটকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। কী আশ্চর্য! ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে অ-ইসলামী পদ্ধতির মাধ্যমে! মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, ফেৎনাবাজ আলেমরা ফেৎনা সৃষ্টি করবে। ওরা হবে আকাশের নিচে নিকৃষ্টতম জীব। এরা কুরআনের শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে, ইসলাম ইসলাম বলবে তবে প্রকৃত ইসলাম থাকবে না। তাদের দখলে বড় বড় মসজিদ থাকবে তবে তাতে হেদায়াত থাকবে না (ভাবার্থ)।

—নির্বাহী সম্পাদক।

পাক্ষিক আহমদীর ৫৬তম জন্মদিনে সকল গ্রাহক, পাঠক এবং সুহৃদদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও প্রীতি। তৎসঙ্গে কামনা করি সকল প্রকার সাহায্য ও সমর্থন। বকেয়া চাঁদা প্রেরণ করুন এবং নূতন বৎসরের চাঁদা সত্বর প্রেরণ করুন। ধন্যবাদ।

—আহমদী কর্তৃপক্ষ।

Grade - 505272

আহ্‌মদী

15th July, 1994

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ~~৫০২২৯৫~~ ৫০২২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury